ইউনিট ২

প্রাচীন সভ্যতাসমূহ

ভূমিকা

পৃথিবীতে মানব সভ্যতার ইতিহাস প্রাচীন। আজকের মানব সভ্যতা এক দিনে গড়ে ওঠেনি। ইতিহাসের দৃষ্টিতে মানব সভ্যতার দুটো যুগ। এক. প্রাগৈতিহাসিক যুগ- এটা হলো ইতিহাসের পূর্বের যুগ। অর্থাৎ যখনকার ইতিহাস জানা যায়, তারও পূর্বের যুগ। দুই- ঐতিহাসিক যুগ। যে যুগের ইতিহাস আমরা জানি। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অবসানের মধ্য দিয়ে সভ্যতার সূত্রপাত হয়েছে। বিশ্ব সভ্যতার যাত্রা শুরু হয় আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫,০০০ অব্দ থেকে। ইতিহাস থেকে প্রাচীন সভ্যতাসমূহের কথা জানা যায়। প্রাচীন সভ্যতাসমূহের মধ্যে- মিশরীয় সভ্যতা, মেসোপটেমীয় সভ্যতা, সুমেরীয় সভ্যতা, ব্যবিলনীয় সভ্যতা, এ্যাসিরীয় সভ্যতা, ক্যালডীয় সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা, ফিনিশীয় সভ্যতা, পারস্য সভ্যতা, হিব্রু সভ্যতা, চৈনিক সভ্যতা, গ্রিক সভ্যতা ও রোমান সভ্যতা- মানব সভ্যতায় বিশেষ অবদান রেখেছে। এই ইউনিটে এসব সভ্যতাসমূহের পরিচয় এবং সভ্যতায় তাদের অবদান তুলে ধরা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ–

- ➔ পাঠ ১ : মিশরীয় সভ্যতা
- ➔ পাঠ ২ : মেসোপটেমীয় সভ্যতা
- ➔ পাঠ ৩ : সুমেরীয় সভ্যতা
- ➔ পাঠ ৪ : ব্যাবিলনীয় সভ্যতা
- ➔ পাঠ ৫ : এ্যাসিরীয় সভ্যতা
- ➔ পাঠ ৬ : ক্যালডীয় সভ্যতা
- ➔ পাঠ ৭ : সিন্ধু সভ্যতা
- ➔ পাঠ ৮ : ফিনিশীয় সভ্যতা
- ➔ পাঠ ৯ : পারস্য সভ্যতা
- ➔ পাঠ ১০ : হিব্রু সভ্যতা
- ➔ পাঠ ১১ : চীন সভ্যতা
- ➔ পাঠ ১২ : গ্রিক সভ্যতা
- ➔ পাঠ ১৩ : রোমান সভ্যতা

পাঠ-১ : মিশরীয় সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- ☞ প্রাচীন মিশরীয়দের পরিচয় দিতে পারবেন।
- ☞ মানব সভ্যতায় মিশরীয়দের অবদান বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ মিশরীয়দের বিজ্ঞান চর্চা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

১.১ পরিচয়

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০-৫২৫ অব্দ। এ সময়কালে মিশরীয়গণ এক উন্নতমানের নগর সভ্যতা গড়ে তোলে। কৃষি, বাণিজ্য, শিল্পকলা, সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি প্রাচীন মিশরীয়দেরকে সভ্যতার ইতিহাসে এক গৌরবময় স্থান দিয়েছে।

মিশরীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল- রাজ পরিবারের সদস্যবর্গ, পুরোহিত, অভিজাত, লিপিকর, ব্যবসায়ী, শিল্পী, কৃষক ও ভূমিদাস। সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিরাট পার্থক্য ছিল। মিশরীয়দের মধ্যে এক-বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। এমনকি আইনসঙ্গতভাবে ফারাওদের (রাজাদের) একাধিক বিয়ে করার অধিকার ছিল না। মিশরীয় সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক এবং মেয়েরা উচ্চ সামাজিক মর্যাদা ভোগ করত। সমাজের অধিকাংশ মানুষ কৃষিকাজে নিয়োজিত ছিল। উৎপাদিত ফসলের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল- তুলা, গম, যব, পীচ ও পিঁয়াজ। মিশরীয় অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য। মিশরীয় জনগণের মধ্যে একটা বিরাট অংশ পাথর শিল্প, নৌযান তৈরি, মাটির পাত্র, কাচ এবং বয়নশিল্পে নিয়োজিত ছিল। মিশরীয়গণ বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করত। পুরাতন রাজবংশের সময় প্রধান দেবতা ছিলেন সূর্যদেবতা 'রে' অথবা 'রা'। নীলনদের দেবতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন ওসিরিস। মিশরীয়দের মতে এই দুই দেবতাই সমগ্র বিশ্ব পরিচালনা করতেন।

১.২ সভ্যতায় প্রাচীন মিশরীয়দের অবদান

বিশ্ব সভ্যতায় প্রাচীন মিশরীয়দের অবদান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মিশরীয় সভ্যতার অবদান নিচে আলোচনা করা হল :

চাষাবাদ

নীলনদের তীরে প্রাচীন মিশরীয়গণ চাষাবাদের মাধ্যমে ফসল ফলাত। তাদের ফসল বন্যার কবল হতে রক্ষার জন্য তারা তৈরি করত বাঁধ। আবার শুষ্ক মৌসুমে পানি সেচ দেয়ার জন্য খাল কেটে গড়ে তুলেছিল পানি সেচের ব্যবস্থা। মিশরীয়রাই প্রথম সরকারি ব্যবস্থাপনায় চাষাবাদ চালু করে।

কারখানা নির্মাণ

প্রাচীন মিশরীয়গণ খনি হতে আহরণ করত তামা আর টিন। এ দুই ধাতু হতে তারা তৈরি করত ব্রোঞ্জ। পাথরের চেয়ে ব্রোঞ্জের অস্ত্র ও দ্রব্যসামগ্রী বেশি কার্যকর। তাই এসব দ্রব্য তৈরির জন্য গড়ে ওঠে ছোট ছোট কারখানা। খনি, ধাতু, কাচ, বয়ন, মৃৎ, জাহাজ নির্মাণ শিল্পের জন্য মিশর প্রসিদ্ধ ছিল।

রাষ্ট্রের উদ্ভব

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা না করতে পারলে সবকিছু বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে। তাই প্রয়োজনের মুখে প্রাচীন মিশরের মানুষ একটি প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলে। যোগ্য ব্যক্তি হতেন তাদের দলপতি। তার কথা সবাই মান্য করত। এভাবে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের প্রধান নিয়ন্ত্রক ছিলেন রাজা। প্রাচীন মিশরের রাজাদের বলা হতো 'ফারাও'। সূর্য দেবতার সন্তান হিসেবে তিনি ছিলেন আমানরে। ৩২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রাজা মেনেস প্রথম রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাতা। তিনি একই সাথে রাজা ও প্রধান পুরোহিত ছিলেন।

ধর্ম

প্রাচীন মিশরের সভ্যতা বিকাশে ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ধর্মীয় চেতনা মিশরীয়দের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। মিশরীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় ধর্মের প্রভাব স্পষ্ট। মিশরীয় সাহিত্য ও দর্শন ধর্মের আলোকে গড়ে উঠেছিল। ধর্মের বিধি-বিধান দিয়ে রাষ্ট্র শাসন করা হতো। ধর্মভিত্তিক গড়ে ওঠা প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করত দেশের অর্থনীতি। শুরুতে বহু দেব-দেবতায় মিশরীয়রা বিশ্বাসী ছিল। তাদের প্রাচীন ধর্মীয় সভ্যতায় কুসংস্কার প্রবেশ করলে তা দূর করার জন্যে এগিয়ে আসেন ফারাও চতুর্থ আথেনহোটেপ। তিনি বহু দেবতার বদলে একমাত্র সূর্য দেবতার আরাধনার কথা প্রচার করেন। সূর্য দেবতার নাম দেন এটন। দেবতার নামের সাথে মিল রেখে নিজের নাম দেন 'ইখনাটন'। এভাবে ইখনাটন প্রাচীন মিশরীয়দের মাঝে এক ঈশ্বরের ধারণা দেয়। মিশরীয়রা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী ছিল। তারাই প্রথম শেষ বিচার ও পৃথিবীতে কৃতকর্মের উপর স্বর্গ ও নরকে পাঠানোর বিষয় উল্লেখ করে। ধর্ম-কর্ম পরিচালনার জন্য মিশরে পুরোহিত শ্রেণী গড়ে ওঠে।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

মিশরীয়দের বলা হয় ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা। ফারাও, অভিজাত আর ধনীদের জন্য তৈরি হলো বড় বড় দালানকোঠা। পাথর কেটে কেটে তারা প্রকাণ্ড সব সৌধ বানাতে ছিল খুব দক্ষ। তাদের এসব সৌধ হচ্ছে মিশরের বিখ্যাত পিরামিড। সবচেয়ে বড় পিরামিড ফারাও খুফুর পিরামিড যার উচ্চতা ৪৮১ ফুট। তারা মৃত্যুর পর আরেকটি জীবনে বিশ্বাসী ছিল। সে জীবনেও রাজা হবেন ফারাও। তাই তাদের মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্যে তৈরি করা হয়েছিল পিরামিড। আর মধ্যরাজ বংশের আমলে পিরামিডের বদলে ফারাওরা তৈরি করেন ধর্ম মন্দির। সবচেয়ে বড় মন্দির কারনাক মন্দির। ভাস্কর্যের অধিকাংশ নিদর্শন দেখা যায় সমাধি, সৌধ ও মন্দিরের প্রবেশ পথে। মন্দিরের ভেতরের দেয়াল সাজানো হতো মূর্তি খোদাই করে। মিশরীয় ভাস্কর্যের সবচেয়ে গৌরব 'স্ফীংস' তৈরিতে। বহুখণ্ড পাথরের গায়ে ফুটিয়ে তোলা হতো এ ভাস্কর্য। এর দেহ ছিল সিংহের আর মাথা ছিল ফারাওয়ের। এর দ্বারা বুঝানো হতো ফারাও সিংহের মতো বলবান।

চিত্র ও কারুশিল্প

মিশরের চিত্রশিল্পীরাও পিছিয়ে ছিলেন না। সমাধি আর মন্দিরের দেয়াল সাজাতে গিয়েই চিত্রশিল্পের সূচনা হয়। চিত্রশিল্পীদের প্রিয় রঙ ছিল সাদা আর কালো। প্রাচীন মিশরীয়গণ কারুশিল্পেও ছিল পারদর্শী। তাদের তৈরি বাহারি রঙের মাটির পাত্রগুলো ছিল চমৎকার। তাদের বয়ন শিল্পীগণ তৈরি করত বিচিত্র কম্বল, পর্দা ও কুশন। বিভিন্ন ধরনের অলংকার তৈরিতেও মিশরীয়রা ছিল দক্ষ। কারুশিল্পেও বিশেষ অবদান রাখে।

লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন

মিশরীয়রা প্রথম লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন করে। তাদের লিখন পদ্ধতির নাম হায়ারোগ্লিফিস্ক। তারা এমনি ২৪টি ব্যঞ্জনধ্বনি বা চিহ্ন আবিষ্কার করে। তারা প্যাপিরাসের পাতায় লিখত, ক্রীট, ফিনিশিয়া, লিভিয়া সভ্যতা এ লিপির ব্যবহার করে।

বিজ্ঞান

ধর্মের কারণে মিশরীয়দের মাঝে জ্ঞানের চর্চা হতো। যেহেতু ফারাও মৃত্যুর পর পরকালের রাজা হবেন, সেহেতু তার মৃতদেহকে পচন থেকে রক্ষার জন্য মিশরীয় বিজ্ঞানীরা মমি তৈরি করতে শেখেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে ও জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে মিশরীয় বিজ্ঞানীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মিশরীয়রা প্রথম ৩৬৫ দিনের সৌর বছর ও সৌর পঞ্জিকা অধিকার করে। অংক শাস্ত্রের পাটিগণিত ও জ্যামিতির উদ্ভাবন করে। চিকিৎসা শাস্ত্রে তারাই সর্বপ্রথম "মেটেরিয়া মেডিকা" বা ঔষধের তালিকা প্রণয়ন করে।

সার-সংক্ষেপ

প্রাচীন মিশরীয়দের নানা অবদানে বিশ্ব সভ্যতা সমৃদ্ধ হয়েছে যুগে যুগে। তাই স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে তাদেরকে ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নির্মাতা বলা যায়। চিত্রলিপির উদ্ভাবন, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে অভূতপূর্ব অগ্রগতি, পাটিগণিত, জ্যামিতি ও মৃতদেহ সংরক্ষণের উপায় উদ্ভাবন, মেটেরিয়া মেডিকা প্রণয়নের মাধ্যমে প্রাচীন মিশরীয়গণ সভ্যতার ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.১

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করুন :

১. প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০-৫২৫ অব্দ।
২. মিশরীয় প্রাচীন সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না।
৩. প্রাচীন মিশরীয়গণ খনি হতে আহরণ করত তামা ও টিন।
৪. প্রাচীন মিশরের রাজাদের বলা হতো 'ফারাও'।
৫. মিশরীয়দের বলা হয় ইতিহাসের প্রতিষ্ঠাতা।
৬. মিশরীয়দের ধর্ম স্থানকে বলা হয় পিরামিড।
৭. মৃত দেহকে পচন থেকে রক্ষার জন্য মিশরীয় বিজ্ঞানীরা মমি তৈরি করার কৌশল উদ্ভাবন করেন।
৮. মিশরের সবচেয়ে বড় মন্দিরের নাম কারণাক মন্দির।
৯. মিশরের লেখন পদ্ধতির নাম কিউনিফর্ম।
১০. মিশরীয়রা চন্দ্র পঞ্জিকা আবিষ্কার করে।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার পরিচয় দিন।
২. সভ্যতায় প্রাচীন মিশরীয়দের পাঁচটি অবদানের কথা লিখুন।
৩. প্রাচীন মিশরের সভ্যতা বিকাশে ধর্মের ভূমিকা নিরূপণ করুন।
৪. স্থাপত্য চিত্রশিল্প ও লিখন পদ্ধতি উদ্ভাবনে মিশরীয়দের অবদান লিখুন।
৫. 'পিরামিড' ও 'মমি' সম্বন্ধে টীকা লিখুন।

পাঠ-২ : মেসোপটেমীয় সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি -

☞ মেসোপটেমীয় সভ্যতার অবস্থান সম্পর্কে বলতে পারবেন।
☞ মেসোপটেমিয়ার অন্তর্ভুক্ত সভ্যতাসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
☞ মেসোপটেমীয় সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

২.১ মেসোপটেমীয় সভ্যতার অবস্থান

আধুনিক ইরাক রাষ্ট্রের সীমারেখার মধ্যেই প্রাচীনকালে মেসোপটেমীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এই উর্বর ভূখণ্ডের উত্তরে আর্মেনিয়ার পার্বত্যাঞ্চল, পশ্চিম ও দক্ষিণে আরব মরুভূমি, দক্ষিণ-পূর্বে পারস্য উপসাগর, পূর্বে এলাম পার্বত্যাঞ্চল এবং পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর অবস্থিত।

২.২ মেসোপটেমিয়ার অন্তর্ভুক্ত সভ্যতাসমূহ

গ্রিক শব্দ মেসোপটেমিয়ার অর্থ হচ্ছে দুই নদীর মধ্যবর্তী দেশ। খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৫০০০ অব্দে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে মিশরীয় সভ্যতার সমকালীন একটি সভ্যতা গড়ে ওঠে। এই সভ্যতাটি ইতিহাসে মেসোপটেমীয় সভ্যতা নামে পরিচিত। মেসোপটেমীয় অঞ্চলে বেশ কয়েকটি সভ্যতার বিকাশ ঘটে। যেমন- সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, এ্যাসিরীয়, ক্যালডীয় ও আক্কাদীয় সভ্যতা। সভ্যতাগুলোর ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকলেও একই ভূখণ্ডে গড়ে উঠার কারণে এগুলোকে একত্রে মেসোপটেমীয় সভ্যতা বলা হয়।

২.৩ মেসোপটেমীয় সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য

ভৌগোলিক কারণে মেসোপটেমিয়া ছিল বিভিন্ন প্রকার মানুষের আগমন ও বিদেশী আক্রমণের জন্য উন্মুক্ত। ফলে উত্তর-পূর্ব মালভূমি হতে প্রাচীনকালে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষ মেসোপটেমিয়ার উর্বর ভূমিতে বসতি স্থাপনের চেষ্টা করে। দক্ষিণে অবস্থিত আরব মরুভূমি হতে মরু বেদুইনরা মেসোপটেমিয়া আক্রমণের চেষ্টা করে। মেসোপটেমিয়া মিশরের মতো কোন একক রাজার শাসনাধীনে ছিল না। মন্দিরের প্রাচুর্য ও অবস্থান দেখে ধারণা করা হয় এই অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন মন্দিরের নিয়ন্ত্রণে বাঁধা ছিল। আর সার্বিক জীবন পরিচালনায় পুরোহিতদের ভূমিকা ছিল প্রধান। তাছাড়া মেসোপটেমিয়ায় দেখা যায় কঠিন আইন ও কঠোর শাস্তির বিধান।

সার-সংক্ষেপ

টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী উর্ব্বর সমতল ভূমিতে মেসোপটেমীয় সভ্যতার উদ্ভব হয়। শুধু একটি নয় বরং এ অঞ্চলে একই সাথে আরো পাঁচটি সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। তবে বিদেশী আক্রমণ ও প্রাকৃতিকভাবে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জন্য উন্মুক্ত এই জনপদ কোন একক রাজার শাসনাধীনে ছিল না। বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে মেসোপটেমীয় সভ্যতার নানামুখী অবদান রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.২

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি খাতায় লিখুন :

১. প্রাচীন মেসোপটেমিয়া হচ্ছে বর্তমান কালের —
ক. ইরান খ. জেরুজালেম
গ. ইরাক ঘ. কুয়েত

২. মেসোপটেমীয় সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত ছিল —
ক. মিশরীয় সভ্যতা খ. চৈনিক সভ্যতা
গ. সুমেরীয় সভ্যতা ঘ. সিন্ধু সভ্যতা

৩. মেসোপটেমীয় শব্দ দ্বারা কি বুঝায়?
ক. নদী তীরবর্তী এলাকা খ. দুই নদীর মধ্যবর্তী সমতল ভূমি
গ. উঁচু মালভূমি ঘ. সমুদ্রে অবস্থিত দ্বীপপুঞ্জ

৪. কোন দুটি নদীর তীরে মেসোপটেমীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে?
ক. টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদী খ. মিসিসিপী-মিসোরীয়
গ. গঙ্গা-যমুনা নদী তীরে ঘ. হোয়াং হো-ইয়াং সিকিয়াং

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মেসোপটেমীয় সভ্যতার পরিচয় ও অবস্থানের বর্ণনা দিন।
২. মেসোপটেমীয় সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত সভ্যতাসমূহের বিবরণ দিন।
৩. মেসোপটেমীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-৩ : সুমেরীয় সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি -

☞ সুমেরীয় সভ্যতার অবস্থান ও সময়কাল বলতে পারবেন।
☞ সুমেরীয়দের সামাজিক অবস্থা উল্লেখ করতে পারবেন।
☞ মানব সভ্যতায় সুমেরীয় সভ্যতার অবদান বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
☞ সুমেরীয় ধর্ম সম্পর্কে জানতে পারবেন।
☞ প্রশাসনে সুমেরীয়দের অবদান বলতে পারবেন।

৩.১ সুমেরীয় সভ্যতার অবস্থান ও সময়কাল

মেসোপটেমীয় অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলায় প্রথম নেতৃত্ব দেয় সুমেরীয়রা। সুমেরী একটি জাতির নাম। তাদের আদি বাসস্থান ছিল মেসোপটেমিয়ার (বর্তমান ইরাক) উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এলামের পাহাড়ি অঞ্চলে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে এদের একটি শাখা মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণে বসতি গড়ে তোলে। তাদের নামানুসারে এ অঞ্চলটির নাম সুমেরীয় অঞ্চল। আর তাদের সভ্যতাকে বলা হয় সুমেরীয় সভ্যতা। সুমেরীয়রা খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দের পূর্বেই সুমেরু নগর গড়ে তোলে।

৩.২ সুমেরীয়দের সামাজিক অবস্থা

সুমেরীয় সমাজের মানুষ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যেমন–

অভিজাত সম্প্রদায় : উচ্চ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল শাসক, পুরোহিত, অভিজাত, সামন্ত প্রভু, বণিক, শিল্পমালিক এবং উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা।

মধ্য শ্রেণী : মধ্য শ্রেণীতে অবস্থান ছিল চিকিৎসক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের স্বাধীন ভূমিমালিক (কৃষক) শ্রমিক।

নিম্ন শ্রেণী : নিম্ন শ্রেণীর অধিবাসী ছিল দাস, ভূমিদাস ও সাধারণ শ্রমিক তথা সর্বসাধারণ।

ধর্ম : সুমেরীয় ধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমত, সুমেরীয়রা বহু দেবতায় বিশ্বাসী ছিল। দ্বিতীয়ত, সুমেরীয় ধর্ম ছিল ইহজাগতিক ধর্ম। তৃতীয়ত, সুমেরীয় ধর্মে নৈতিকতা অনুপস্থিত ছিল। তারা বৃষ্টি, বাতাস, পানি, উর্বরতা, প্লেগ রোগ ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতা মনে করত। তাদের কেন্দ্রীয় ধর্মমন্দিরকে বলত 'জিগুরাত' আর ধর্মগুরুকে বলত 'পাতেজি'।

৩.৩ সভ্যতায় সুমেরীয়দের অবদান

সুমেরীয়দের সভ্যতায় অবদান ছিল নিম্নরূপ :

প্রশাসনে অবদান

২৮০০ খ্রি. পূর্বাব্দের আগে সুমেরীয় সভ্যতা ৩০টি নগররাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। নগররাষ্ট্রের প্রধানের পদবি ছিল পাতেশি। তিনি একাধারে পুরোহিত, সেনাপ্রধান, কৃষি বিভাগের প্রধান ছিলেন। ২৮০০ খ্রি. পূর্বাব্দে ডুঙ্গি ৩০টি নগররাষ্ট্র নিয়ে প্রথম একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

লিখন পদ্ধতির আবিষ্কার

সুমেরীয়রা একটি ভিন্ন ধরনের লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিল। মিশরীয়দের মতো প্রথম দিকে তারা চিত্রলিপি ধরনের লেখা শুরু করে। দ্রুত ভাব প্রকাশের জন্য ধীরে ধীরে লিখন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসে। এভাবেই মেসোপটেমিয়ায় একটি নতুন ধরনের লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটে। কাদামাটির শ্লেটে নল-খাগড়ার কলম দিয়ে এক রকম কৌণিক রেখা ফুটিয়ে তোলা হতো। খাঁজ কাটা এ চিহ্নগুলো দেখতে অনেকটা ইংরেজি অক্ষর "V" এর মতো। আবার কখনো কখনো তীরের মতো ডিজাইন। প্রাচীন সুমেরীয়দের এ লিপির নাম দেয়া হয় কিউনিফর্ম যা মেসোপটেমীয় লিপি হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে। সুমেরীয় ভাষায় ৫০০ এর বেশি কিলবাকার সংকেতিক চিহ্ন ছিল। এই লিপি বাম থেকে ডানে লেখা হতো।

কৃষি

সুমেরীয়দের আয়ের মূল উৎস ছিল কৃষি। তারা কৃষিকার্য পরিচালনার জন্যে উন্নত সেচ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। গম, যব, বার্লি, খেজুর, শাক-সবজি চাষ করত।

আইন

সুশৃঙ্খল জীবন পরিচালনার জন্য সুমেরীয়গণ একটা আইনের কাঠামো গড়ে তোলে। প্রাচীন সুমেরীয় সম্রাট 'ডুঙ্গি' এ আইন তৈরি করেন। তাদের আইন ছিল খুব কঠোর। চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত ও অঙ্গের পরিবর্তে অঙ্গ কর্তন ছিল আইনের বিধান।

ডুঙ্গির আইন

পৃথিবীর প্রথম আইন সংকলন। এই আইন ছিল প্রতিশোধমূলক। পরবর্তী অনেক সভ্যতা এই আইন অনুসরণ করে।

ব্যবসা-বাণিজ্য

সুমেরীয়গণ চারপাশের দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। ফিলিস্তিন, ফিনিশিয়া, ক্রীট, ইজিয়ান দ্বীপমালা, এশিয়া মাইনর এবং মিশরের সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। ভারতের সাথেও তাদের ব্যবসায়িক যোগাযোগ ছিল বলে ধারণা করা হয়।

বিজ্ঞানে তাদের অবদান

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সুমেরীয়দের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তারা জলঘড়ি, চন্দ্র পঞ্জিকা আবিষ্কার করেন। তারা জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চাও করতেন। গণিতশাস্ত্রেও তারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল বলে জানা যায়। ৩৬০ ডিগ্রিতে বৃত্ত বিভাগ, ৬০ ভিত্তিক গণনা পদ্ধতি চালু করে।

ভাস্কর্য ও স্থাপত্য

সুমেরীয়গণ ভাস্কর্য নির্মাণেও ভূমিকা রেখেছেন। সিলমোহর নির্মাণ করে ও ধাতব দ্রব্য খোদাই করে তারা মূর্তি তৈরি করত। চিত্রশিল্পের বিকাশে তাদের দক্ষতা কম নয়। জিগুরাট নির্মাণে উন্নত স্থাপত্য রীতি ব্যবহার করে।

সার-সংক্ষেপ

সুমেরীয়রাই মূলত মেসোপটেমীয় সভ্যতার ভিত্তি গড়ে তোলে। সুমেরীয়দের আদি অবস্থান ছিল মেসোপটেমিয়ার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত এলামের পাহাড়ি অঞ্চলে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে এদের একটি শাখা মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণে বসতি গড়ে তোলে। তাদের নাম অনুসারে অঞ্চলটির নাম সুমেরীয় অঞ্চল। মেসোপটেমীয় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত সভ্যতাসমূহের মধ্যে সুমেরীয় সভ্যতা অন্যতম। এটি মূলত একটি কৃষিভিত্তিক সভ্যতা। সমাজ ব্যবস্থা ছিল শ্রেণীভিত্তিক। সুমেরীয় মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন শাসক। সভ্যতায় তাদের বড় অবদান হলো কিউনিফর্ম লিপি ও গণনা পদ্ধতির আবিষ্কার। সুশৃঙ্খল জীবনের জন্য তারা আইনের কাঠামো তৈরি করে। ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প ও সাহিত্যের বিকাশে তাদের অবদান স্মরণযোগ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.৩

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

খালি স্থানে সঠিক শব্দটি লিখুন :

১. সুমেরী একটি —— নাম।
২. সুমেরীয়দের আদি বাসস্থান ছিল মেসোপটেমিয়ার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত —— পাহাড়ি অঞ্চল।
৩. জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে ৪০০০ অব্দে এদের একটি শাখা —— দক্ষিণে বসতি গড়ে তোলে।
৪. সুমেরীয়দের নামানুসারে এ অঞ্চলটির নাম —— অঞ্চল।
৫. সুমেরীয়রা খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দের পূর্বেই —— নগর গড়ে তোলে।
৬. সুমেরীয় প্রথম রাজার নাম ——।
৭. সুমেরীয়দের কেন্দ্রীয় মন্দিরের নাম ——।
৮. সুমেরীয় নগর রাজ্যের প্রধানকে —— বলা হতো।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সুমেরীয় সভ্যতার অবস্থানস্থল ও সময়কাল উল্লেখ করুন।
২. সুমেরীয়দের সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করুন।
৩. সভ্যতায় সুমেরীয়দের অবদান বিশ্লেষণ করুন।
৪. সুমেরীয়দের ধর্ম ও লেখন পদ্ধতির বর্ণনা দিন।

পাঠ-৪ : ব্যাবিলনীয় সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি -

☞ ব্যাবিলনীয় সভ্যতার অবস্থান ও সময়কাল নিরূপণ করতে পারবেন।
☞ ব্যাবিলনীয় সভ্যতার সামাজিক অবস্থা বলতে পারবেন।
☞ মানব সভ্যতায় ব্যাবিলনীয় সভ্যতার অবদান উল্লেখ করতে পারবেন।

৪.১ ব্যাবিলনীয় সভ্যতার অবস্থান ও সময়কাল

সিরিয়ার মরুভূমি অঞ্চলে আমোরাইট নামক এক জাতি বসবাস করত। এরা এক সময় মেসোপটেমিয়ায় এসে নগর সভ্যতা গড়ে তোলে। এদের এই সভ্যতাকে বলে ব্যাবিলনীয় সভ্যতা। এ সভ্যতার পত্তন হয় খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে। আমোরাইট নেতা হাম্মুরাবী ছিলেন ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা।

৪.২ সামাজিক অবস্থা

ব্যাবিলনীয় সমাজের মানুষ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল :

উচ্চ শ্রেণী : উচ্চ শ্রেণীতে অবস্থান করত রাজা, পণ্ডিত, পুরোহিত ও সৈন্য। এদের নিজস্ব জমি ছিল।

মধ্য শ্রেণী : শিল্পী ও স্বাধীন ব্যবসায়ীদের মনে করা হতো মধ্যশ্রেণীর লোক।

নিম্ন শ্রেণী : নিম্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল কৃষক, সাধারণ শ্রমিক ও দাস। সাধারণত যুদ্ধবন্দিদের দাস করা হতো।

গ্রিস, রোম, এশিয়া মাইনর, পারস্য, সিন্ধুদেশসহ প্রতিবেশী অঞ্চলগুলোর সাথে ব্যাবিলনীয়দের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। পার্বত্য অঞ্চলের মানুষেরা ব্যাবিলনীয়দের কাছ থেকে শিল্পজাত দ্রব্য কিনত। ব্যাবিলনীয়রা আমদানি করত স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা, কাঠ ও খনিজ লবণ। তারা ভারতবর্ষ থেকে হাতির দাঁত ও মরুভূমি অঞ্চল থেকে উট সংগ্রহ করত। ব্যাবিলনীয়রা ঘোড়ার ব্যবহার জানত।

৪.৩ সভ্যতায় ব্যাবিলনীয়দের অবদান

আইনের শাসন

ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় আইনের শাসন লক্ষ্য করা যায়। তাদের আইন ছিল প্রতিশোধমূলক। যেমন- দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ, হাতের বদলে হাত, জীবনের বদলে জীবন ইত্যাদি। ২৮২টি আইনে ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবার, সম্পত্তি, কৃষি, দাসসহ সবধরনের আইনের উল্লেখ ছিল। আইন সংকলক হিসেবে হাম্বুরাবি অমর হয়ে আছেন। তিনি ছিলেন সুমেরীয় আইনের প্রভাবে প্রভাবিত। তাই ব্যাবিলনীয় আইনে সুমেরীয় আইনের প্রভাব দেখা যায়। হিব্রু, ফিনিশিয়, রোমান সভ্যতায় এই আইনের প্রভাব রয়েছে।

বিজ্ঞানে

ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় বিজ্ঞান চর্চার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন আবিষ্কারে তাদের অবদান রয়েছে। ব্যাবিলনীয় সভ্যতার যুগে গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যায় উন্নয়ন ঘটে। চাঁদ পর্যবেক্ষণ করে ব্যাবিলনে পঞ্জিকা তৈরি হয়েছিল।

ঘরবাড়ি নির্মাণ

ব্যাবিলনে পাথুরে পাহাড় নেই। তাই রোদে শুকানো ইট দিয়ে তারা ঘরবাড়ি বানাত। ব্যাবিলনীয় কারিগররা বিভিন্ন ধাতব দ্রব্য, মাটির পাত্র ও ঝুড়ি নির্মাণ করত বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

ধর্মীয় প্রভাব

ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় ধর্মের প্রভাব দেখা যায়। প্রথমত, তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসক ছিল। তাদের প্রধান দেবতার নাম 'মারদুক' আর প্রধান দেবী 'ইশতার'। তাদের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ দেবতার নাম- 'তাম্মুজ'। আর অপদেবতার নাম ছিল হর্ডস। দ্বিতীয়ত, পরকাল বা মৃত্যুর পর পুনর্জন্মের কোন ধারণা ব্যাবিলনীয়দের ছিল না। তাদের ধর্মচিন্তায় কুসংস্কারের প্রাধান্য ছিল। তৃতীয়ত, মন্দির ব্যাবিলনীয় ধর্মে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছিল।

শিল্পকলা

ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় তৈলচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। তাদের আঁকা বিভিন্ন ছবি পাওয়া গেছে। জিগুরাট মন্দির পক্তে শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য কীর্তি, একটি মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে যা ৭ তলা বিশিষ্ট।

ভাষা ও সাহিত্য

ব্যাবিলনীয়গণ সাহিত্য চর্চা করতেন। কিউনিফর্ম লিপিতে লেখা হয় তাদের বিখ্যাত মহাকাব্য গিলগামেশ। তাদের ভাষা ছিল ৩০০ ধ্বনি চিহ্ন বিশিষ্ট।

সার-সংক্ষেপ

ব্যাবিলনীয় সভ্যতার বিভিন্ন দিক আলোচনা করে আমরা বুঝতে পারি, বর্তমান বিশ্ব সভ্যতার পিছনে তাদের অনেক অবদান বিদ্যমান। প্রাচীন ব্যাবিলন নগরকে কেন্দ্র করে এই সভ্যতা গড়ে ওঠে। তাদের বড় অবদান হলো- পৃথিবীতে তারাই প্রথম লিখিত আইন প্রণয়ন করে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে তারা অনেক উন্নতি করতে পেরেছিল। বিশেষ করে আইনের ক্ষেত্রে ব্যাবিলনীয় সভ্যতা চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.৪

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. ব্যাবলনীয় সভ্যতার পত্তন হয়—
ক. খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে খ. খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে
গ. খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দে ঘ. ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে

২. ব্যাবিলনীয় সভ্যতা কোথায় গড়ে ওঠে?
ক. মিশরে খ. মেসোপটেমীয় অঞ্চলে
গ. রোমে ঘ. ভারতে

৩. ব্যাবিলনীয় সভ্যতার যুগে সবচেয়ে বেশি উন্নয়ন ঘটে—
ক. গণিতশাস্ত্রে খ. জ্যোতির্বিদ্যায়
গ. পঞ্জিকায় ঘ. আইনশাস্ত্রে

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ব্যাবিলনীয় সভ্যতার অবস্থান ও সময়কাল নিরূপণ করুন।
২. ব্যাবিলনীয়দের সামাজিক অবস্থা কেমন ছিল।
৩. সভ্যতায় ব্যাবিলনীয়দের অবদান বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ-৫ : এ্যাসিরীয় সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি -

☞ এ্যাসিরীয় সভ্যতার পরিচয় দিতে পারবেন।
☞ সভ্যতায় এ্যাসিরীয়দের অবদান বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

৫.১ এ্যাসিরীয় সভ্যতা

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১০০০-৯০০ অব্দের মধ্যে এ্যাসিরীয় সভ্যতার পত্তন ঘটে। প্রাচীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে এ্যাসিরীয় সভ্যতা অন্যতম। ব্যাবিলন থেকে প্রায় দু'শ মাইল উত্তরে টাইগ্রিস নদীর তীরে একটি শহর গড়ে ওঠে। সমৃদ্ধ এ শহরের নাম এ্যাসুর। এ শহরের অধিবাসীরা এ্যাসিরীয় নামে পরিচিত ছিল। প্রথমদিকে কৃষিকাজ আর পশুপালন করে এরা জীবন চালাত। কিন্তু জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে বেঁচে থাকার জন্য তাদের হাত বাড়াতে হয় প্রতিবেশী দেশগুলোর দিকে। ফলে এ্যাসিরীয়রা ক্রমে যোদ্ধা জাতিতে পরিণত হয়। সামরিক ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তারা গোলন্দাজ বাহিনী গঠন করে এবং যুদ্ধরথের ব্যবহার করে। সে যুগের বিবেচনায় তাদের সেনাবাহিনী ছিল বেশ আধুনিক। ক্রমে এ্যাসিরীয় রাষ্ট্র একটি সামরিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

এ্যাসিরীয় সম্রাট বিশ্বাস করতেন তিনি দেবতা অসুরের প্রতিনিধি। সব কিছুর ওপর তাঁর কর্তৃত্ব। প্রতিবেশী রাষ্ট্র দখলের ফলে ক্রমে এ্যাসিরীয় সাম্রাজ্যের সীমারেখা অনেক বেড়ে যায়। শাসন কার্যের সুবিধার জন্য সাম্রাজ্যকে কতগুলো প্রদেশে ভাগ করা হয়। এ্যাসিরীয় সমাজ কাঠামো ব্যবিলনীয় সমাজের মতোই ছিল। এ্যাসিরীয়দের অর্থনীতির মূল উৎস ছিল বিভিন্ন দেশ থেকে লুণ্ঠন করে আনা ধনসম্পদ। অল্প বিস্তর বাণিজ্যও তারা করত।

ধর্ম

ধর্মীয় ক্ষেত্রে এ্যাসিরীয়রা ব্যাবিলনীয়দের অনুসরণ করে। তারা বহু দেব-দেবতায় বিশ্বাস ও তাদের পূজা করত। তবে তাদের প্রধান দেবতা ছিল আসুর। এরপর ছিল ইশতারের স্থান। রাজা দেবতা আসুরের নামে রাজ্য শাসন করতেন। তারা কুসংস্কার ও তন্ত্র-মন্ত্রে বেশি বিশ্বাসী ছিল।

৫.২ সভ্যতায় এ্যাসিরীয়দের অবদান

সভ্যতার ইতিহাসে বেশ কিছু ক্ষেত্রে এ্যাসিরীয়দের অবদান লক্ষ্য করা যায়—

সামরিক ক্ষেত্রে

সামরিক ক্ষেত্রে এ্যাসিরীয়দের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভূমিকা ছিল। তারা সর্বপ্রথম লোহার অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনী গঠন করে ও যুদ্ধ রথের ব্যবহার করে। সে যুগের বিচারে তাদের সৈন্যবাহিনী ছিল বেশ আধুনিক। বহু নতুন নতুন অস্ত্র, যুদ্ধ কৌশল আবিষ্কারের কারণে প্রতিবেশীদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। সামরিক প্রয়োজনে শক্তিশালি গুপ্তচর ও যাতায়াত ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্প

ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পে এ্যাসিরীয়দের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। বিভিন্ন রাজার সময় রাজধানী পরিবর্তনের ফলে এ্যাসিরীয় স্থাপত্যগুলো বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিল। তাদের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য কর্ম হচ্ছে- মন্দির, সুরম্য প্রাসাদ ও দুর্গ। উল্লেখ্য যে সামরিক প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়েই তারা তাদের স্থাপত্য কর্ম সম্পাদন করত। আর ভাস্কর্যে এ্যাসিরীয়দের অগ্রগতি ছিল স্থাপত্যের চেয়ে অধিক। ভাস্কর্যের বিষয় ছিল বৈচিত্র্যময়। যেমন- শত্রু নগরী ধ্বংস, যুদ্ধ বিজয়, যুদ্ধ যাত্রা, সম্রাটের সিংহ শিকার প্রভৃতি। ভাস্কর্যগুলো চুনাপাথর দিয়ে তৈরি ছিল এবং চিত্রিত ছিল বিভিন্ন রঙের যেমন- সাদা, নীল, লাল ও সবুজ। এছাড়াও তাদের ব্রোঞ্জের তৈরি অনেক ভাস্কর্য পাওয়া যায়। সর্বোপরি এ্যাসিরীয়রা পাথর দিয়ে ঘর-বাড়ি নির্মাণ ও তৈজসপত্র তৈরিতে দক্ষ ছিল।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে

জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাদের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। সম্রাট আশুরবনিপালের গড়া একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার পাওয়া গেছে রাজধানী নিম্পরে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ্যাসিরীয়দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তারাই প্রথম বৃত্তকে ৩৬০° তে ভাগ করে। পৃথিবীকে

সর্বপ্রথম তারা অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশে ভাগ করেছিল। চিকিৎসাবিদ্যায় এ্যাসিরীয়দের ভূমিকা ছিল অসামান্য। তারা পাঁচশ'রও বেশি উদ্ভিদ ও খনিজ ওষুধের তালিকা প্রণয়ন করে সেগুলোর গুণাগুণ ও ব্যবহার পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করে।

৫.৩ এ্যাসিরীয়দের পতন

মানব সভ্যতার ইতিহাসে কোন সভ্যতাই দীর্ঘদিন পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেনি। বিকাশের এক পর্যায়ে এসে তার পতন ঘটেছে। এ্যাসিরীয়দের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। উত্তরসূরি শাসকদের বিভিন্ন দুর্বলতা এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর আক্রমণের মুখে তিন'শ বছরের এই প্রাচীন সভ্যতা খ্রিস্টপূর্ব ৬১২ অব্দে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.৫

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন :

১. এ্যাসিরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল- ব্যাবিলনে/টাইগ্রিস নদীর তীরে/সিন্ধু নদীর তীরে।
২. প্রথম দিকে এ্যাসিরীয়দের পেশা ছিল- কৃষিকাজ ও পশু পালন/যুদ্ধ-বিগ্রহ/ লুটতরাজ।
৩. পরবর্তী সময়ে এ্যাসিরীয়দের পরিচয় ঘটে- সামরিক রাষ্ট্র হিসেবে/যোদ্ধা জাতি হিসেবে/লুটেরা জাতি হিসেবে।
৪. এ্যাসিরীদের দেবতার নাম- দেবতা শশাঙ্ক/দেবতা আসুর/দেবতা হিমাঙ্ক।
৫. এ্যাসিরীয়দের অর্থনীতির মূল উৎস ছিল- লুট করে আনা ধন-সম্পদ/পশুপালন ও কৃষিকাজ/ব্যবসা-বাণিজ্য।
৬. সর্বপ্রথম লোহার অস্ত্রে সজ্জিত বাহিনী গঠন করে- ব্যাবিলনীয়রা/গ্রিকরা/এ্যাসিরীয়রা।
৭. চিকিৎসাবিদ্যায় এ্যাসিরীয়দের অবদানের মধ্যে ছিল- পাঁচশরও বেশি উদ্ভিদ ও খনিজ ওষুধের তালিকা তৈরি/হাজারের ও বেশি ওষুধের আবিষ্কার।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. এ্যাসিরীয় সভ্যতার পরিচয় দিন।
২. সভ্যতায় এ্যাসিরীয়দের অবদান উল্লেখ করুন।

পাঠ-৬ : ক্যালডীয় সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি -

☞ ক্যালডীয় সভ্যতার পরিচয় দিতে পারবেন।

☞ সভ্যতায় ক্যালডীয়দের অবদান উল্লেখ করতে পারবেন।

৬.১ ক্যালডীয়দের পরিচয়

৬১২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এ্যাসিরীয়দের পতন এবং ক্যালডীয়দের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মেসোপটেমীয় সভ্যতা চূড়ান্ত পর্বে উন্নীত হয়। মেসোপটেমিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পারস্য উপসাগরীয় এলাকায় বসবাসকারী সেমিটিক জাতিভুক্ত ক্যালডীয়রা এ সভ্যতা গড়ে তোলে বলে ইতিহাসে এটি ক্যালডীয় সভ্যতা নামে পরিচিত। এ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা নেবোপালেসার এ্যাসিরীয়দের সমৃদ্ধ রাজধানী নিনেভা ধ্বংস করে পুনরায় ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী ব্যাবিলনকে কেন্দ্র করে রাজধানী ও তাদের সভ্যতা গড়ে তোলে বলে এ সভ্যতা নতুন ব্যাবিলনীয় সভ্যতা নামেও পরিচিত। এ সাম্রাজ্যের উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন সম্রাট নেবুচাঁদ নেজার। তাঁর রাজত্বকাল ছিল খ্রিস্টপূর্ব ৬০৪ থেকে ৫৬১ অব্দ পর্যন্ত। হাম্মুরাবির পর থেকে প্রায় এক হাজার বছরব্যাপী যুদ্ধ বিগ্রহ আর হানাহানিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল মেসোপটেমিয়া। নেবুচাঁদ নেজারের হাতে ব্যাবিলন আবার শক্তি ফিরে পায়। সিরিয়া অধিকার করে রাখা মিশরীয়দের তিনি তাড়িয়ে দেন। নেবুচাঁদ নেজার খুব কঠোর শাসক ছিলেন। তাঁর শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় তিনি জেরুজালেম নগরী খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দে ধ্বংস করে দেন এবং ইহুদি অধিবাসীদের বন্দি করে খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৮ অব্দ পর্যন্ত ব্যাবিলনে আটকে রাখেন। ইতিহাসে এর নাম 'ব্যাবিলনীয় বন্দিদশা'। খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৮ অব্দে ক্যালডীয় সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে পারস্য সম্রাট কাইরাস ক্যালডীয়দের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।

৬.২ সভ্যতায় ক্যালডীয়দের অবদান

সভ্যতার ইতিহাসে বেশ কিছু ক্ষেত্রে ক্যালডীয়দের অবদান লক্ষ্য করা যায়। তাদের সভ্যতার বিভিন্ন দিক নিম্নরূপ :

ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান নির্মাণ

ব্যাবিলনীয় সভ্যতার স্থপতি হাম্মুরাবির সংস্কৃতি অনেকটাই গ্রহণ করেছিল ক্যালডীয়রা। সেই সাথে নিজেদের বুদ্ধিমত্তার সংযোগ তাদেরকে অনেক এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ক্যালডীয় সম্রাট নেবুচাঁদ নেজারের সময় ব্যাবিলন শহর খুব জাঁকজমকপূর্ণ হয়। পুরো শহর ঘিরে ৫৬ মাইল লম্বা দেয়াল তৈরি হয়। চার ঘোড়ার রথ চলতে পারে এমন চওড়া ছিল রাস্তা। শহরের মাঝখানে ছিল প্রকাণ্ড তোরণ। দেবী ইস্টারের স্মরণে তৈরি এই তোরণের নাম রাখা হয় 'ইস্টার তোরণ' বা 'ইস্টার গেট'। তোরণের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া লম্বা রাস্তাটির নাম ছিল 'মিছিল সড়ক'। সম্রাট নেবুচাঁদ নেজারের রানি বাগান করতে খুব পছন্দ করতেন। তাঁরই উৎসাহে সম্রাট নগর দেয়ালের উপরে তৈরি করলেন আশ্চার্য সুন্দর এক বাগান। ইতিহাসে যা 'শূন্য উদ্যান' নামে পরিচিত। ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান প্রাচীন পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটি।

ধর্মীয় বিশ্বাস

ক্যালডীয়রা আকাশের বিভিন্ন গ্রহকে দেবতা ভাবত। বৃহস্পতি বা জুপিটার গ্রহ ছিল প্রধান দেবতা। তাকে তারা মারডক নাম দেয়। তারা ভাগ্যে বিশ্বাসী ছিল। ব্যাবিলন শহরে বেশ কিছু ধর্মমন্দিরের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ধর্মে নৈতিকতার কোন স্থান ছিল না।

জ্যোতির্বিদ্যায় তাদের অবদান

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষত জ্যোতির্বিদ্যায় তাদের যথেষ্ট অবদান লক্ষ্য করা যায়। ধর্মীয় কারণে তারা গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে অনেক গবেষণা করেছে। তাই জ্যোতির্বিদ্যায় তারা হয়ে উঠেছিল দক্ষ। ক্যালডীয়রাই প্রথম সপ্তাহকে সাত দিনে বিভক্ত করে। আবার প্রতিদিনকে ১২ জোড়া ঘণ্টায় ভাগ করার পদ্ধতি বের করে। বছরের দৈর্ঘ্যও তারা বের করে। এ যুগের জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ ১২টি নক্ষত্রপুঞ্জের সন্ধান পান। তা থেকে ১২টি রাশিচক্রের সৃষ্টি হয়।

অতএব, ক্যালডীয় সভ্যতার ইতিহাস হতে আমরা বুঝতে পারি, আধুনিক সভ্যতায় তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.৬

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

শূন্যস্থান পূরণ করুন :

ক্যালডীয় সভ্যতা —— সভ্যতার মধ্যে অন্যতম। এরা —— শহরকে কেন্দ্র করে মেসোপটেমিয়ায় প্রভুত্ব বিস্তার ঘটায়। ব্যাবিলন শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠায় ক্যালডীয় সভ্যতা ইতিহাসে —— —— সভ্যতা হিসেবেও পরিচিত। সম্রাট —— গড়ে তুলেছিলেন এ সভ্যতা। সম্রাট নেবুচাঁদ নেজারের রাজত্বকাল ছিল খ্রিস্টপূর্ব ৬০৪ থেকে ৫৬১ অব্দ পর্যন্ত। হাম্মুরাবির পর থেকে প্রায় —— বছরব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহ আর হানাহানিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল মেসোপটেমিয়া। নেবুচাঁদ নেজারের হাতে ব্যাবিলন আবার শক্তি ফিরে পায়। সিরিয়া অধিকার করে রাখা —— তিনি তাড়িয়ে দেন। নেবুচাঁদ নেজার খুব কঠোর শাসক ছিলেন। তাঁর শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় তিনি —— নগরী খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ অব্দে ধ্বংস করে দেন এবং —— —— —— করে খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৮ অব্দ পর্যন্ত ব্যাবিলনে আটকে রাখেন। ইতিহাসে এর নাম ‘ব্যাবিলনীয় বন্দিদশা’।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ক্যালডীয় সভ্যতার পরিচয় দিন।
২. সভ্যতায় ক্যালডীয়দের অবদান উল্লেখ করুন।

পাঠ-৭ : সিন্ধু সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি -

☞ সিন্ধু সভ্যতার অবস্থান ও সময়কাল বলতে পারবেন।

☞ সভ্যতার বিভিন্ন অঙ্গনে তাদের অবদান মূল্যায়ন করতে পারবেন।

৭.১ অবস্থান ও সময়কাল

বর্তমান পাকিস্তানের উত্তর-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়েছে বিশাল সিন্ধু নদ। সিন্ধ নদ দক্ষিণে আরব সাগরে পতিত হয়েছে। সিন্ধু নদের উত্তর-পূর্বে পাঞ্জাবে ছিল হরপ্পা নগরীর অবস্থান। আর দক্ষিণে লারকানা জেলায় ছিল মহেঞ্জোদারো নগরী। সিন্ধু নদের পানিতে তৈরি এ বিশাল উর্বর ভূমিতে গড়ে উঠেছিল যে সভ্যতা, তাকে বলা হয় সিন্ধু সভ্যতা। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার জন মার্শালের মতে- প্রাচীন এ সভ্যতাটি খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫০ থেকে ২৭৫০ অব্দের মধ্যে পূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করেছিল। উত্তর-পূর্ব পাঞ্জাবে সিন্ধু নদের উপনদী রাভীর তীর ঘেঁষে প্রাচীন হরপ্পা নগরী এবং লারকানা জেলায় মূল সিন্ধুর তীরে এক বর্গমাইল এলাকা জুড়ে মহেঞ্জোদারো নগরীটির অবস্থান ছিল। আর হরপ্পা নগরের সমতল ভূমির পরিমাণ ছিল আড়াই মাইল।

তবে সিন্ধু সভ্যতার সঠিক সময়কাল এবং কারা এ সভ্যতা গড়ে তুলেছিল সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য এখন পর্যন্ত জানা যায় নি। সিন্ধু সভ্যতা থেকে প্রাপ্ত সিলমোহর ও অন্যান্য নিদর্শন থেকে ধারণা করা হয় যে, এ সভ্যতার আদিবাসীরা লিখতে ও পড়তে জানত। কিন্তু এ লেখাগুলো থেকে এখন পর্যন্ত কোন তথ্য ও পাঠোদ্ধার করা যায় নি। এদের সিল ও মাটির পাত্রের সাথে মেসোপটেমীয় দ্রব্যের মিল দেখে এ সভ্যতার আনুমানিক সময়কাল নির্ণয় করা হয়েছে। ধারণা করা হয় যে, দ্রাবিড় জাতি-এ সভ্যতা গড়ে তুলেছিল।

৭.২ সিন্ধু সভ্যতার অবদান

নগর পরিকল্পনা

সভ্যতার ইতিহাসে সিন্ধু সভ্যতা একটি পরিকল্পিত নগরীর ধারণা দিয়েছে। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো নগরী দুটো প্রায় একই পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে উঠেছিল। এখানে নগরবাসীদের সকল সুবিধা দেয়া হয়েছিল। যেমন- রাস্তাঘাট, সরবরাহকৃত পানি, ময়লা নিষ্কাশনের ব্যবস্থা, স্নানাগারের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, ময়লা ফেলার জন্য ডাস্টবিন, শহরে বাতি দ্বারা আলোকিত করা প্রভৃতি। নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সৈন্য মোতায়েন করা প্রভৃতি। সিন্ধু সভ্যতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সিন্ধু সভ্যতা আধুনিক সভ্যতার মতো উন্নত ছিল।

পরিমাপ পদ্ধতি

ওজন করার জন্য পরিমাপ পদ্ধতির উদ্ভাবন করা ছিল সিন্ধু সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তারা ওজন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের বাটখারা ব্যবহার করত। আর কোন কিছুর দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য ব্যবহার করত স্কেল।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে মিশর ও মেসোপটেমিয়ার মতো সিন্ধু সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। চমৎকার সব স্থাপত্যের নিদর্শন রয়েছে সিন্ধু সভ্যতায়। তাদের ঘরবাড়িগুলো দেখলে সহজে বুঝা যায়- নগরবাসীরা বিলাসী ছিল। মহেঞ্জোদারোর স্থাপত্যের চমৎকার উদাহরণ হলো ‘বৃহৎ হল।’ ৮০ ফুট জায়গা জুড়ে তৈরি হয়েছিল এ ঘরটি। ঘরে ছিল সারি বাঁধা বেঞ্চ আর সামনে মঞ্চ। এটি একটি সভাগৃহ ছিল বলে ধারণা করা হয়। হরপ্পাতে ১৬৯×১৩৫ ফুটের একটা প্রকাণ্ড গুদামঘর পাওয়া গেছে।

পাথর ও ব্রোঞ্জের প্রচুর ভাস্কর্য পাওয়া গেছে সিন্ধু সভ্যতায়। সেখানে বিভিন্ন মানুষের ও পশুর নিখুঁত এমন মূর্তি পাওয়া গেছে যাতে তাদের দক্ষতার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া গেছে প্রায় ২৫০০ সিল। পাথরের তৈরি এ সিলগুলোর অধিকাংশই ছিল চারকোণা। সিলগুলোতে বিভিন্ন চিহ্ন- ষাঁড়, মহিষ প্রভৃতি পশুর প্রতিকৃতি ছিল। এগুলো এক ধরনের চিত্রলিপি বলে মনে করা হয়। বাণিজ্য ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে এ সমস্ত সিল ব্যবহার করা হতো।

শিল্পজাত দ্রব্য

সিন্ধু সভ্যতায় বেশ কিছু শিল্পজাত দ্রব্য পাওয়া গেছে। এখানে বিভিন্ন প্রকার খেলনা তৈরি হতো। গোলাকার বিভিন্ন মাটির পাত্রে ফুটিয়ে তোলা হতো বিভিন্ন নকশা। মাটি ছাড়া সিন্ধু সভ্যতার কারিগররা রুপা, তামা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতির দ্বারা তৈজসপত্র তৈরি করত। স্বর্ণ শিল্পীরা বিভিন্ন আকৃতির অলংকার তৈরি করতে ছিল দক্ষ। তারা সোনা, রুপা, তামা, ইলেকট্রোন ও ব্রোঞ্জ দ্বারা আংটি, বালা, নাকফুল, গলার হার, কানের দুল, বাজুবন্দ প্রভৃতি অলংকার তৈরি করত।

সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংস

সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয় ২৭০৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতে, এ সময় প্রলয়ঙ্করী বন্যা হয়। বন্যায় হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো নগরী তলিয়ে যায়। প্রাপ্ত নিদর্শন থেকে ধারণা করা হয় যে, ক্রমাগত বন্যায় নগর দুটি ধীরে ধীরে মাটির নিচে হারিয়ে যায়।

সার-সংক্ষেপ

সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে প্রধানত দুটো অঞ্চলে-পাঞ্জাবের হরপ্পায় এবং সিন্ধুর মহেঞ্জোদারোতে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, এ এলাকায় জনগোষ্ঠী গ্রামীণ জীবন ত্যাগ করে সুপরিকল্পিত নগরের পত্তন ঘটিয়েছিল। আধুনিক সভ্যতায় সিন্ধু সভ্যতার অনেক অবদান রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.৭

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দিন :

১. সিন্ধু নদের উত্তর-পূর্বে পাঞ্জাবে কোন প্রাচীন নগরীর অবস্থান ছিল?
২. মহেঞ্জোদারো নগরী কোন জেলায় গড়ে উঠেছিল?
৩. স্যার জন মার্শালের মতে, সিন্ধু সভ্যতাটি কখন পূর্ণভাবে বিকাশ লাভ করেছিল?
৪. হরপ্পা নগরটি সিন্ধুর কোন উপনদীর তীরে গড়ে উঠেছিল?
৫. দ্রাবিড় জাতি কোন সভ্যতা গড়ে তুলেছিল?
৬. প্রাচীন কোন সভ্যতাকে আধুনিক সভ্যতার মতো উন্নত বলে মনে করা হয়?
৭. সিন্ধু সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান লিখুন।
৮. হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে কতটি সিল পাওয়া গেছে?
৯. কিভাবে, কখন সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হয়?

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সিন্ধু সভ্যতার অবস্থান ও সময়কালের বিবরণ দিন।
২. সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনা কেমন ছিল?
৩. সিন্ধু সভ্যতার স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বর্ণনা দিন।
৪. সিন্ধু সভ্যতার অবদান উল্লেখ করুন।
৫. সিন্ধু সভ্যতায় কি কি শিল্পজাত দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে?

পাঠ-৮ ঃ ফিনিশীয় সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি -

☞ ফিনিশীয়দের অবস্থান ও পরিচয় বলতে পারবেন।

☞ সভ্যতায় ফিনিশীয়দের অবদান বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

৮.১ অবস্থান ও পরিচয়

ভূমধ্যসাগর এবং লেবানন পর্বতের মাঝে একশত পঁচিশ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য এবং পনের কিলোমিটার প্রস্থ সম্বলিত একখণ্ড সরু উপকূল অঞ্চলে ফিনিশীয় নামের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটি গড়ে উঠেছিল। ফিনিশীয় একটি সম্প্রদায়ের নাম। তাদের সামনে ছিল সাগর আর পিছনে ছিল পাহাড়। তাই বাইরের আক্রমণের তেমন ভয় ছিল না। কৃষিকাজ করার মতো কোন উর্বর ভূমি না থাকায় তাদের আয়ের একমাত্র উৎস ছিল বাণিজ্য। ফিনিশীয়রা ছিল শান্তিপ্রিয়। যুদ্ধ পছন্দ করত না বলে তারা সাম্রাজ্য গড়তে পারেনি। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে তাদের উত্থান হয়েছিল। নানা ঘটনা প্রবাহের পর ৩৩২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিক বীর আলেকজান্ডার টায়ার নগরী দখল করে একে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেন। আর তখনই ফিনিশীয় সভ্যতার পতন ঘটে।

৮.২ সভ্যতায় ফিনিশীয়দের অবদান

প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে ফিনিশীয়দের পরিচয় শ্রেষ্ঠতম নাবিক ও জাহাজ নির্মাতা হিসেবে। তাদের মূল অবদানসমূহ জড়িয়ে আছে নৌ-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে। তাদের ছিল অনেকগুলো সমুদ্র বন্দর। তাদের বিখ্যাত দুটি বন্দর হলো - টায়ার ও সিডন। সভ্যতায় ফিনিশীয়দের অবদান নিম্নরূপ :

নৌকা নির্মাণ

লেবাননে ছিল সিডার গাছের বন। তাই গাছ কেটে নৌকা বানানো ছিল তাদের জন্য সহজ। ফিনিশীয় বণিকগণ জাহাজ নিয়ে ব্যবসার জন্য ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগড় পাড়ি দিত। তারা সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে পোতাশ্রয়, বড় বড় জাহাজ ও বন্দর নির্মাণ করে। সমুদ্রপথে তারা ক্রীট, মাইসেনীয় ও পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ তৈরি করে ও সেখানে তাদের বাণিজ্যিক উপনিবেশ গড়ে ওঠে। ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে সিডন, ঢায়ার আরাদুস ও বাই ব্রোসকে কেন্দ্র করে ফিনিশীয়রা মিশর, এশিয়া মাইনর, বলকান উপদ্বীপ, ইতালি ও পশ্চিম ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম নাবিক ও জাহাজ নির্মাতা হিসেবে ফিনিশীয়দের খ্যাতি ছিল প্রচুর। মূলত ফিনিশীয়রাই প্রথম পৃথিবীর ইতিহাসে সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক সভ্যতা গড়ে তোলে।

বাণিজ্য

ফিনিশীয়দের উন্নতির মূলে ছিল নৌ-বাণিজ্য। ফিনিশীয়গণ বিভিন্ন দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। তারা স্পেন থেকে সোনা, রুপা ও টিন এনে তা বিভিন্ন দেশে বিক্রি করত। এ সমস্ত দেশ হতে সংগ্রহ করত হরেক রকম জিনিস। যেমন- কাচ, মাটির পাত্র, হাতির দাঁতের বাহারি চিরুনি, মণি-মুক্তা খচিত আসবাবপত্র, ব্রোঞ্জের বরকোশ, মূল্যবান পোশাক ইত্যাদি। এ সব আবার বিক্রি করা হতো পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলোর ধনীদের নিকট।

কারিগরি দক্ষতা

ফিনিশীয়রা বাণিজ্যের পাশাপাশি কারিগরি ক্ষেত্রেও দক্ষতা অর্জন করেছিল। তারা মাটির পাত্র তৈরি করতে পারত। তারা দক্ষতার সাথে কাপড় তৈরি ও রং করতে পারত। নকশাকাটা ধাতবদ্রব্যও তৈরি করত ফিনিশীয়রা। গ্রিক কবি হোমারের লেখায় ফিনিশীয়দের তৈরি পোশাক ও সোনার অলংকারের কথা রয়েছে। হিব্রুদের গ্রন্থে রয়েছে ফিনিশীয়দের সোনা, রুপা, লোহা ও কাঠের দ্রব্যের কথা। এ্যাসিরীয়দের রাজপ্রাসাদের আসবাবপত্র তৈরি করে দিয়েছিল ফিনিশীয় কারিগররা। তারা জেরুজালেমে তৈরি করেছিল মন্দির।

সাংস্কৃতিক জগতে অবদান

ফিনিশীয় নাবিকরা রাতে তারা দেখে জাহাজ চালাত। ধ্রুবতারা দেখে তারা দিক নির্ণয় করত। এ কারণে ধ্রুবতারাকে অনেকে ফিনিশীয় তারা বলে থাকে। সভ্যতার ইতিহাসে ফিনিশীয়দের বড় অবদান হলো- বর্ণমালার উদ্ভাবন। তারা ২২টি ব্যঞ্জনবর্ণের উদ্ভাবন করে। আধুনিক বর্ণমালার সূচনা এখান থেকে। ফিনিশীয়দের উদ্ভাবিত বর্ণমালার সাথে পরবর্তীতে গ্রিকরা স্বরবর্ণ যোগ করে বর্ণমালাকে পূর্ণতা দান করে। এছাড়া গ্রিকরা ফিনিশীয়দের কাছ থেকে কলম, কালি ও কাগজের ব্যবহার শেখে।

সার-সংক্ষেপ

আধুনিক সভ্যতা ফিনিশীয় সভ্যতার কাছে বহুদিক দিয়ে ঋণী। কেননা বর্ণমালা সৃষ্টির মাধ্যমে তারা শিক্ষার পথকে সুগম করেছিল যা পরবর্তী সভ্যতাকে কয়েক ধাপ অগ্রসর করে দিয়েছিল। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে নৌ-বাণিজ্য শক্তি হিসেবে ফিনিশীয় সভ্যতার উত্থান। বাণিজ্যের উপর নির্ভর করে এবং সমুদ্র বন্দরকে কেন্দ্র করে এরা গোটা ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলে উপনিবেশ গড়ে তোলে। কারিগরি দক্ষতা ও আধুনিক বর্ণমালা প্রতিষ্ঠার জন্য এ সভ্যতা স্মরণীয় হয়ে আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.৮

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ বসিয়ে পূরণ করুন :

১. ভূমধ্যসাগর এবং —— পর্বতের মাঝে একশত পঁচিশ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য এবং পনের কিলোমিটার প্রস্থ সম্বলিত একখণ্ড সরু উপকূল অঞ্চলে —— নামের রাষ্ট্রটি গড়ে উঠেছিল।

২. ফিনিশীয় একটি —— নাম।

৩. প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে ফিনিশীয়দের পরিচয় শ্রেষ্ঠতম —— ও —— নির্মাতা হিসেবে।

৪. ফিনিশীয়দের দুটি বিখ্যাত সমুদ্র বন্দর হলো টায়ার ও ——।

৫. ফিনিশীয়দের উন্নতির মূলে ছিল ——।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. ফিনিশীয়দের পরিচয় ও অবস্থান সম্বন্ধে বর্ণনা দিন।

২. সভ্যতায় ফিনিশীয়দের অবদান নিরূপণ করুন।

৩. নৌ-বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক জগতে ফিনিশীয়দের অবদান মূল্যায়ন করুন।

পাঠ-৯ : পারস্য সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি -

☞ পারস্য সভ্যতার পরিচয় ও সময়কাল বলতে পারবেন।
☞ পারস্য সভ্যতার অবদান নির্ণয় করতে পারবেন।

৯.১ পারস্য সভ্যতার পরিচয় ও সময়কাল

আজকের ইরান দেশটি প্রাচীনকালে পারস্য নামে পরিচিত ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৫৫৯ অব্দ থেকে ৩০০ অব্দের মধ্যে এখানে গড়ে উঠেছিল এক উন্নত সভ্যতা। এ সভ্যতার অধিবাসীরা সামরিক শক্তিতে খ্যাতিমান ছিল। আর তাই একটি রাজ্য ক্রমে সাম্রাজ্যে পরিণত হয়ে পড়ে। সভ্যতার ইতিহাসে দুটি ক্ষেত্রে পারসীয়দের অবদান ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটি সুষ্ঠু ও দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং দ্বিতীয় ধর্মীয় ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারণা নিয়ে আসা।

৯.২ সভ্যতায় পারসীয়দের অবদান

বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারসীয়রা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা পরবর্তী কয়েকটি সভ্যতাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। সভ্যতায় পারসীয়দের অবদান নিম্নে তুলে ধরা হলো :

পারস্য প্রশাসন

সুন্দরভাবে সাম্রাজ্য পরিচালনা করার জন্য সম্রাট দারিয়ুস একটি দক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন। শক্তভাবে সাম্রাজ্য শাসনের জন্য সম্রাটের হাতে রাখা হয় অনেক ক্ষমতা। তিনি একাধারে সামরিক, বেসামরিক ও বিচার বিভাগের প্রধান ছিলেন। সম্রাট দারিয়ুস সুন্দরভাবে সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য পুরো সাম্রাজ্যকে চার ভাগে বিভক্ত করে চারটা রাজধানী গড়ে তোলেন। এগুলো হলো- সুসা, একবাটানা, ব্যাবিলন ও পার্সেপলিস। এছাড়া পারস্য সাম্রাজ্যকে ২১টি প্রদেশে ভাগ করা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে যোগাযোগের জন্য তৈরি করা হয় রাস্তাঘাট। দারিয়ুসের সময় একটি শক্তিশালী নৌবাহিনীও গঠিত হয়।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবদান

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারসীয়দের বিরাট অবদান রয়েছে। সম্রাট দারিয়ুস চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নয়নের জন্য কাজ করেন। মিশরীয় চিকিৎসা বিদ্যালয়কে তিনি সংস্কার করেন। জ্যোতির্বিদ্যার উন্নয়নেরও সম্রাটের দৃষ্টি ছিল। বিখ্যাত ক্যালডীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী 'নেবুরিমানু'কে তিনি সব ধরনের সহযোগিতা দেন। এছাড়া ক্যালডীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী 'কিদিনু'ও পারস্য সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। সম্রাট দারিয়ুস ১২ মাসে বছর ও ৩০ দিনে মাস গণনার রীতি চালু করে পারসীয় দিনপঞ্জি তৈরি করেন।

লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার

পারসীয়গণ দুটি ভাষায় লিখতে জানত। একটি হলো এ্যাসিরীয় আর অন্যটি প্রাচীন পারসীয়। প্রথম দিকে পারসীয়রা এ্যাসিরীয় কিউনিফর্ম লিপিতেই লিখত। এরা ৩৯টি কিউনিফর্ম চিহ্ন ব্যবহার করত। ধীরে ধীরে পারসীয়দের একটি নিজস্ব লিখন রীতি তৈরি হয়।

শিল্পকলা

পারসীয়রা শিল্পকলার ক্ষেত্রে খুব বেশি ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয় নি। তবে 'পাসারগাদিয়া' ও 'পার্সেপালিসে' সম্রাট কাইরাস ও দারিয়ুস এর প্রাসাদ স্থাপত্যের ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতার প্রমাণ বহন করছে। প্রাসাদের ছাদ ছিল কাঠের তৈরি। উজ্জ্বল রঙের ইট দিয়ে দেয়াল সাজানো হয়েছিল। রাজা ও ভৃত্যের ছবি আঁকা হতো দেয়ালে। পারস্য স্থাপত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হলো পিরামিডের আকৃতিতে তৈরি সম্রাট কাইরাসের সমাধি।

ধর্মের ক্ষেত্রে ভূমিকা

পারসীয়রা ধর্মের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রাচীনকালে পারসীয়রা সূর্য, বৃষ্টি, বাতাস, আকাশ, মাটি ও আগুনের পূজা করত। ষষ্ঠ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ধর্মের কর্তৃত্ব পুরোহিতদের হাতে চলে গেলে তারা প্রাকৃতিক বিষয়ের বদলে বিভিন্ন পশু-পাখিকে দেবতার মর্যাদার আসনে বসায়। ধীরে ধীরে ধর্মে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। জরথুষ্ট্র নামক একজন ধার্মিক ও দার্শনিক পারসীয়দের নতুন ধর্মের সন্ধান দেন। কথিত আছে, নির্জন পাহাড়ে ধ্যানমগ্ন জরথুষ্ট্রের নিকট স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ আসে। তিনি মানুষের মাঝে ফিরে গিয়ে তা প্রচার করতে থাকেন। তার প্রচারিত এ ধর্মকে বলা হয় জরথুষ্ট্রবাদ।

জরথুষ্ট্রবাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে 'জেন্দআবেস্তা'। জরথুষ্ট্রবাদের মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের মধ্যে প্রচলিত বহু দেবতা ও যাদুবিদ্যার অবসান এবং ধর্মে নৈতিকতা ও দার্শনিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। এ ধর্ম মতে আহুরমাজদা হলো মঙ্গলের দেবতা। আর আহরিমান হলো অমঙ্গলের দেবতা। উভয়ের মধ্যে বিরামহীন সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত আহুরমাজদার জয় হবে। এ ধর্ম মতে পরকালের ধারণা ছিল। সর্বোপরি এটিকে ঐশী ধর্ম মনে করা হতো। তার জীবনধারা, মতবাদ ও ধর্মদর্শন পরবর্তীতে ফিলিস্তিন, আরব ও এশিয়া মাইনরের জনগণকে প্রভাবিত করে।

সার-সংক্ষেপ

পারসীয়দের সভ্যতা আধুনিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠায় বিরাট অবদান রেখেছে। তাদের অবদান বিশ্ব সভ্যতাকে উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী করেছে। বর্তমান ইরান বা পারস্যকে কেন্দ্র করে এবং আরব মরুভূমির উত্তরাংশ থেকে পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের উত্তর ভূমি পর্যন্ত ছিল এই বিশাল পারস্য সভ্যতা। পারস্য সভ্যতার রাজারা সকলেই সামরিক প্রতিভা ও দক্ষতার অধিকারী ছিলেন। তারা সু-শৃঙ্খল প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলেছিলেন। ধর্ম, বিজ্ঞান, শিল্প-কলা ও লিখন পদ্ধতিতে পারস্য সভ্যতার অবদান অবিস্মরণীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.৯

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মিল করুন

১. আজকের ইরান দেশটির প্রাচীন নাম —	১. দক্ষ প্রশাসন ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে নতুন ধারণা।
২. পারস্যবাসীরা —	২. সম্রাট দারিয়ুস।
৩. পারসীদের দু'টো ক্ষেত্রে অবদান ছিল গুরুত্বপূর্ণ তা হলো —	৩. জরথুষ্ট্র।
৪. পারসীয় দিনপঞ্জি তৈরি করেন —	৪. সামরিক শক্তিতে খ্যাতিমান ছিল।
৫. পারসীয়দের নতুন ধর্মের সন্ধান দেন —	৫. পারস্য।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. পারস্য সভ্যতার পরিচয় দিন।
২. সভ্যতায় পারসীয়দের অবদান নিরূপণ করুন।
৩. সুষ্ঠু প্রশাসন পরিচালনায় পারসীয়দের অবদান কি ছিল?
৪. লিখন পদ্ধতি ও বিজ্ঞানে পারসীয়দের কি অবদান আছে?
৫. 'জরথুষ্ট্রবাদ' কোথায়, কিভাবে বিকাশ লাভ করে?

পাঠ-১০ : হিব্রু সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি -

☞ হিব্রু সভ্যতার পরিচয় বলতে পারবেন।
☞ ধর্মীয় ক্ষেত্রে হিব্রুদের অবদান বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

১০.১ হিব্রুদের পরিচয়

বর্তমান প্যালেস্টাইন অঞ্চল ঘিরে প্রাচীনকালে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেটি হিব্রু সভ্যতা নামে পরিচিত। হিব্রু সভ্যতার মূল অবদান হলো ধর্মীয় ক্ষেত্রে। খ্রিস্ট ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম সমগ্র বিশ্বজুড়ে এক ঈশ্বরের আরাধনার যে কথা প্রচার করেছে তার প্রথম সূচনা ঘটিয়েছে হিব্রুরা।

প্যালেস্টাইনের জেরুজালেম নগরীকে কেন্দ্র করে হিব্রু সভ্যতার বিকাশ ঘটে। প্যালেস্টাইনের পূর্বদিকে রয়েছে জর্ডান, পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর, উত্তরে লেবানন ও দক্ষিণে সৌদি আরব। হিব্রুদের উৎপত্তির ইতিহাস খুব স্পষ্ট নয়। তারা নৃতাত্ত্বিকভাবে একটি নতুন জাতি নয়। হিব্রুদের নামের উৎপত্তি সম্পর্কেও সন্দেহ রয়েছে। জানা যায় যে হিব্রুদের শত্রু তাদের 'খাবিরু' অথবা 'হাবিরু' বলে অভিহিত করত। সম্ভবত এই নামটি অপভ্রংশ হয়ে হিব্রু হয়েছে। মনে করা হয় যে হিব্রুগণ ছিল অভিবাসী বা যাযাবর জনসাধারণ, যাদের আদি বাসভূমি ছিল আরবের মরুভূমি এবং বর্তমান ইসরাইলের অধিবাসীগণ হলো হিব্রুদের বংশধর। খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০ অব্দে হযরত ইবরাহীমের (আঃ) নেতৃত্বে হিব্রুগণ উত্তর-পশ্চিম মেসোপটেমিয়ায় বসতি গড়ে তোলে। এর পর ইবরাহীমের ছেলে ইয়াকুব হিব্রুদের নিয়ে প্যালেস্টাইনে বসতি স্থাপন করেন। এখানে হিব্রুদের জীবনে নেমে আসে গাঢ় অন্ধকার। প্যালেস্টাইনে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে অনেক হিব্রু চলে যায় মিশরে। কিন্তু মিশরের ফারাও হিব্রুদের বন্দি করে এবং দাসদের মতো জীবন যাপনে বাধ্য করে। হিব্রুগণ এভাবে অনেক দিন ক্রীতদাসের মতো জীবন ধারণে বাধ্য হয়। এই দুঃখ ও যন্ত্রণার দিনে হিব্রুদের নতুন নেতা হযরত মুসা (আ) এর আবির্ভাব হয়। যিনি হিব্রুদের দাসত্ব হতে মুক্ত করার চেষ্টা করেন। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হিব্রুদের মিশর ত্যাগ করানো। অনেক প্রচেষ্টার পর মুসা (আ) ফারাও-এর অনুমতি পান এবং ১৩০০-১২৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হিব্রুদের নিয়ে আসেন সিনাই অঞ্চলে। কিন্তু এখানেও হিব্রুগণ স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারেনি। এখানে ক্যানানবাসীদের আক্রমণের শিকার হয় হিব্রুরা। এতদ্সত্ত্বেও তারা ক্যানান ভূমিতে কিছুটা অধিকার বিস্তার করতে সমর্থ হয়। কিন্তু এতে শেষ রক্ষা হলো না। দুর্ধর্ষ ফিলিস্তিনীগণের আক্রমণে হিব্রুরা তাদের অধিকৃত ভূমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। হিব্রুদের দুঃখময় জীবনের অবসান ঘটে ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে যখন ডেভিড বা হযরত দাউদ-এর নেতৃত্বে তারা পুনরায় সংগঠিত হয়। হযরত দাউদ জেরুজালেম নগরী গড়ে তোলেন এবং দক্ষ প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করেন। পরবর্তী পর্যায়ে ফিলিস্তিনীগণ সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হলে প্যালেস্টাইন ও সিরিয়া অঞ্চলে হিব্রুদের একটি নিজস্ব ও শক্তিশালী ভূখণ্ড গড়ে ওঠে। হযরত সুলায়মান (সলোমন) (আ) ছিলেন হিব্রুদের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক।

১০.২ ধর্মীয় ক্ষেত্রে হিব্রুদের অবদান

হিব্রুরা তাদের অবদানের প্রায় পুরোটাই রেখেছিল ধর্মীয় ক্ষেত্রে। হিব্রু জাতি সর্বপ্রথম একেশ্বরবাদের প্রচার করে। তাদের নবী হযরত মুসা (আ), হযরত দাউদ (আ) এবং হযরত সুলায়মান (আ) মানুষের ধর্মীয় চেতনায় নতুন আলোড়ন তোলে। তাদের ধর্মীয় চেতনা কতকগুলো পর্যায়ে পেরিয়ে চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছেছিল। নিম্নে পর্যায়গুলো আলোচনা করা হলো :

মুসা (আ) এর আগমনের পূর্বস্তর

হযরত মূসা (আ) এর আগমনের পূর্বে হিব্রুরা বিভিন্ন জড়বস্তু এবং প্রাকৃতিক বিষয়গুলোর পূজা করত। এ সময় যাদুবিদ্যা ও কুসংস্কারে চারদিক ছেয়ে গিয়েছিল। জড়বস্তুর পূজা করতে গিয়ে এক সময় দেহধারী দেবতার আবির্ভাব হয়। তারা দেবতার বিভিন্ন নামকরণ করে। দেবতাদের প্রধান ছিল 'ঈল'।

নির্দিষ্ট দেবতার স্তর

হিব্রুরা দ্বাদশ থেকে নবম খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত 'ইয়াহওয়েহ' নামক নির্দিষ্ট দেবতার পূজা করত। অবশ্য 'ইয়াহওয়েহ' জেহোবা নামেই বেশি পরিচিত ছিল। জেহোবা ছিলেন আইন প্রণেতা ও বিশ্বে নৈতিক আদর্শের স্রষ্টা। কিন্তু ধীরে ধীরে নির্দিষ্ট দেবতার এই স্তরে বিকৃতি প্রবেশ করতে থাকে। এ কারণে দিনে দিনে হিব্রুদের এ ধর্মীয় ধারণায় কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস দানা বাঁধতে থাকে। ফলে হিব্রু নেতারা সতর্ক হয়ে পড়েন। তাঁরা ধর্মীয় চিন্তায় সংস্কারের পদক্ষেপ নেন।

নবীদের আগমনের স্তর

ধর্ম সংস্কারের যুগে আমস, হোসিয়া, ঈসা (আ) এবং মিকাহ্ প্রমুখ নবীদের আবির্ভাব ঘটে হিব্রুদের মাঝে। অষ্টম ও সপ্তম খ্রিস্টপূর্বাব্দে নবীদের প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল হিব্রুদের উপর। তারা সর্বশক্তিমান একমাত্র আল্লাহর আরাধনা করার কথা প্রচার করেছিল।

বিদেশী প্রভাবিত স্তর

নবীদের যুগে হিব্রুধর্মের একটা নিজস্ব কাঠামো তৈরি হলেও তা বিদেশী প্রভাবে ধরে রাখা সম্ভব হয় নি। তখন নানা কারণে পুরোহিত বা যাজকদের ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ায় হিব্রুদের জুগবাদ যাজকীয় ধর্মে রূপান্তরিত হয়।

পারস্য প্রভাবের ফল

পারসীয় সাম্রাজ্যের সংস্পর্শে এসে হিব্রুরা পর জীবনের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। শয়তান হয় অশুভ শক্তির প্রতীক। মৃত্যুর পর আবার জীবন ফিরে পাওয়া ও শেষ বিচারের দিন সম্পর্কিত ধারণা হিব্রু ধর্মে যোগ হতে থাকে।

বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে হিব্রু ধর্ম যে পর্যায়ে পৌঁছেছিল তা পর্যালোচনা করে আমরা বলতে পারি, আধুনিক ধর্মীয় ধারণা সৃষ্টিতে হিব্রু ধর্মের বড় রকমের ভূমিকা রয়েছে।

সার-সংক্ষেপ

হিব্রু সভ্যতা আধুনিক প্যালেস্টাইনের জেরুজালেম নগরীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। বিশ্ব সভ্যতায় হিব্রুদের সবচাইতে বড় অবদান ছিল ধর্ম ক্ষেত্রে। প্রথমে হিব্রুরা প্রকৃতি পূজারি হলেও পরবর্তীতে এদের এখানে এক ঈশ্বর ধর্মের উদ্ভব হয়। হযরত মুসা (আ.) হিব্রুদের এক ঈশ্বরবাদের বাণী শোনান। পরবর্তীকালে নানা বিবর্তন এবং বিদেশী প্রভাব, প্রকৃতি পূজা, মূর্তি পূজা এবং নৈরাজ্যবাদ ধর্মে প্রবেশ করলেও বিভিন্ন নবীদের সংস্কার এবং হিব্রু ধর্ম পালনের নির্দিষ্ট নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে হিব্রু ধর্ম আবার ধর্মের মূল তত্ত্বে ফিরে আসে এবং ক্রমে তাদের ধর্ম আধুনিক একেশ্বরবাদে রূপান্তরিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.১০

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করুন :

১. বর্তমান প্যালেস্টাইন অঞ্চল ঘিরে প্রাচীনকালে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেটি হলো হিব্রু সভ্যতা।
২. হিব্রু সভ্যতার মূল অবদান ছিল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে।
৩. খ্রিস্ট ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম সমগ্র বিশ্বজুড়ে এক ঈশ্বরের আরাধনার যে কথা প্রচার করছে, তার প্রথম সূচনা ঘটিয়েছে হিব্রুরা।
৪. খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০ অব্দে হযরত ইবরাহীমের (আ) নেতৃত্বে হিব্রুগণ উত্তর-পশ্চিম মেসোপটেমিয়ায় বসতি গড়ে তোলে।
৫. মিশরের ফারাও হিব্রুদের স্বাধীন জীবন যাপনের সুযোগ দেন।
৬. হিব্রুদের দুঃখময় জীবনের অবসান ঘটে ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে যখন ডেভিড বা হযরত দাউদ (আ) এর নেতৃত্বে তারা পুনরায় সংগঠিত হয়।
৭. হযরত ইবরাহীম (আ) জেরুজালেম নগরী গড়ে তোলেন।
৮. হযরত সুলায়মান (সলোমন) (আ) ছিলেন হিব্রুদের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. হিব্রুদের পরিচয় দিন।
২. ধর্মীয় ক্ষেত্রে হিব্রুদের অবদান বিশ্লেষণ করুন।

পাঠ-১১ : চীন সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি -

☞ চীন সভ্যতার অবস্থান ও পরিচয় বলতে পারবেন।
☞ চীনের আদি মানুষ সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে পারবেন।
☞ শাং রাজাদের যুগের বর্ণনা দিতে পারবেন।
☞ চৌ রাজাদের যুগ সম্বন্ধে বিবরণ দিতে পারবেন।

১১.১ চীনা সভ্যতার অবস্থান ও পরিচয়

পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম রাষ্ট্র চীন। মিশর, মেসোপটেমীয় এবং সিন্ধু সভ্যতার পরে চীনেও গড়ে উঠেছিল উন্নত সভ্যতা। চীনের তিনটি অঞ্চলে প্রাচীন চৈনিক সভ্যতা গড়ে ওঠে। প্রথমটি হোয়াং হো নদীর তীরে, দ্বিতীয়টি ইয়াং জে কিয়াং নদীর তীরে আর তৃতীয়টি দক্ষিণ চীনের ভূখণ্ডে। চীনের এই প্রাচীন সভ্যতা সৃষ্টি হয় শাং রাজাদের ও চৌ রাজাদের যুগে।

চীনের উত্তর দিকে গোবি মরুভূমি, পশ্চিমে তিব্বতের পার্বত্য অঞ্চল এবং পূর্ব ও দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগরের অবস্থান ছিল। প্রাচীন চীনের নদীসমূহের প্রভাবে একদিকে এখানে যেমন কৃষিভিত্তিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল অন্যদিকে তেমনি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও যোগাযোগের পথ সহজ ও সুগম হয়েছিল, পাশাপাশি বহির্বাণিজ্যের পথও উন্মুক্ত হয়েছিল। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে এখানে সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল।

১১.২ চীনের আদি মানুষ

চীনা উপকথা অনুযায়ী প্রথম মানুষ হলো পান্‌কু। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। চীনে আদি মানুষের সন্ধান পাওয়া গেছে। ১৯২৯ সালে চীনের রাজধানী পিকিং এর নিকট (আধুনিক বেইজিং) আদিম মানুষের মাথার খুলি পাওয়া গেছে; যারা 'পিকিং মানুষ' নামে পরিচিত। এই তথ্য হতে মনে করা যায় যে, নবোপলীয় তথা নতুন পাথরের যুগে চীনে মানুষের বসবাস ছিল। অনুমান করা হয় যে, চীনবাসীরা হোয়াং-হো ও ইয়াংসি নদীর দুটি পাড়েই বসবাস করত। পরে তারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এদের একটা অংশ চাষাবাদ করত এবং অন্য অংশটি যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়াত। যারা চাষাবাদ করত, তারাই নদীর ধারে ঘরবাড়ি তৈরি করে সভ্য মানুষে পরিণত হয়। একই সাথে তারা পশুপালন করত। তারা মাটির তৈরি জিনিসপত্র, রেশমের কাপড়, চাকাযুক্ত গাড়ি, তামা ও ব্রোঞ্জের অস্ত্র-শস্ত্র তৈরি করতে জানত। চাষাবাদে তারা ব্যবহার করত লাঙ্গল, খাল কেটে নদী হতে পানি জমিতে সরবরাহ করত। চীনের আদি মানুষ নগর নির্মাণ করেছিল এবং নগরকে যাযাবরদের আক্রমণ হতে বাঁচানোর জন্য উঁচু দেয়াল তৈরি করেছিল। প্রাচীন চীনের লোকেরা এক প্রকার দিনপঞ্জি বা ক্যালেন্ডার তৈরি করেছিল।

১১.৩ শাং রাজাদের যুগ (১৭৬৬-১০২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)

হোয়াংহো নদীর তীরে শাং রাজারা সভ্যতা গড়ে তোলেন। বেশ কয়েকটি রাজবংশ চীনে সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে পুরানো ছিল শাং বংশ। শাং যুগে ব্রোঞ্জের জিনিসপত্র বেশি ব্যবহৃত হতো বলে এ সময়ের সংস্কৃতি ব্রোঞ্জ সংস্কৃতি নামে পরিচিত।

সভ্যতায় শাং যুগের অবদান

সভ্যতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে শাং যুগের মানুষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। নিম্নে তাদের অবদানের ক্ষেত্রগুলো আলোচনা করা হলো :

অর্থনৈতিক কাঠামো ও বাসস্থান

শাং যুগে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল। বেশি উৎপাদন হতো গম আর যব। কিছু কিছু জমিতে ধান চাষ হতো। শাং যুগের মানুষ ব্যাপকভাবে পশু পালনও করত। এ যুগের গ্রামের মানুষেরা মাটির ঘরে বাস করত। শহরের ঘরবাড়ি ছিল চমৎকার। ঘরগুলো হতো আয়তকার, ছাদগুলো ছিল ত্রিকোণ আকৃতির।

ক্ষুদ্রশিল্প

বিভিন্ন সুন্দর জিনিস তৈরিতে শাং যুগের কারিগররা ছিল অত্যন্ত পারদর্শী। ব্রোঞ্জের তৈরি পাত্র, ছুরি ও কুঠার শাং যুগের বিশেষ আকর্ষণ। হাড়, ঝিনুক, শিং প্রভৃতি দিয়েও শাং কারিগরেরা অনেক দ্রব্য বানাতে পারত। এ যুগে হাতির দাঁতের দ্বারা বিলাসী দ্রব্যও তৈরি হতো। শাং যুগের রকমারি মাটির পাত্র ও বিখ্যাত চীনা মাটির পাত্রও পাওয়া গেছে। তীর, ধনুক, চাকাওয়ালা ঘোড়ার গাড়ি, যোদ্ধাদের জন্য তৈরি চামড়ার বর্ম, অস্ত্রশস্ত্র ও বাদ্যযন্ত্রের মুখোশ প্রভৃতি তৈরিতে শাং কারিগররা ছিল দক্ষ।

লিখন পদ্ধতি

পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল হতে চীন দেশ প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিল। তাই এখানে একেবারে ভিন্ন রীতিতে লিখন পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটে যার নাম আইডিও গ্রাফ। লেখার জন্য তৈরি হয় কালি আর তুলি। শাং লিপিকাররা রেশমি-কাপড়ের উপর লিখতেন। তাদের লিপিগুলো ছিল মোটামুটি চিত্রলিপিভিত্তিক।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে

রাজকার্য পরিচালনা ছাড়াও ধর্মক্ষেত্রে শাং রাজারই প্রধান ছিলেন। তাদের নির্দেশে পুরোহিতরা ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতেন। শাং যুগের মানুষরা মাটি, বাতাস, নদী, বিভিন্ন দিক (যেমন- পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ, উত্তর) ইত্যাদি প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতা মনে করত। বৃষ্টি, শস্য ও শাংতি নামের যুদ্ধের দেবতাই প্রধান দেবতার ভূমিকায় ছিলেন। শাং তি নামের এই দেবতা চীনের ধর্মীয় ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। মৃত রাজাকেও কখনও কখনও পূজা করা হতো। তাই রাজার সমাধি সৌধ বহু মূল্যবান দ্রব্যাদি দ্বারা সজ্জিত করা হতো।

১১.৪ চৌ রাজাদের যুগ (১০২৭-২৪৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)

শাং রাজধানীর উত্তর-পশ্চিমে চৌ-রাজ্য গড়ে উঠেছিল। শাংদের দুর্বলতার সুযোগে চৌ-রা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে এরা চীন সভ্যতার উপর আধিপত্য বিস্তার করে।

সভ্যতায় চৌ যুগের অবদান

শাং রাজাদের সাম্রাজ্যকে জয় করে চৌ রাজাগণ সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন এবং সভ্যতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবদান রাখেন। তাদের অবদানগুলো নিম্নরূপ :

অর্থনৈতিক

চৌ জাতিরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কার করেন। তাদের অর্থনীতির মূল উৎস কৃষি। এ যুগে কৃষিকাজে পশু ব্যবহার করা হতো। খাল খনন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের মধ্য দিয়ে এ সময় চীনে প্রচুর ধান উৎপন্ন হতো।

বাণিজ্যিক

চৌ জাতিরা বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে অনেক বড় বড় শহর গড়ে তোলে। এ সময় চীনা বণিকরা বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। তারা গাধা ও উটের সাহায্যে মালামাল পরিবহন করত। শস্য, লবণ, রেশম ইত্যাদি দ্রব্য দেশের বাইরে রপ্তানি করা হতো।

সামাজিক কাঠামো

তখন সমাজ ছিল আভিজাতদের নিয়ন্ত্রণে। ভূস্বামী ও কৃষকদের মধ্যে ছিল আকাশ-পাতাল ব্যবধান। সাধারণ কৃষক ও ভূমিদাসদের অবস্থান ছিল সমাজের সবচেয়ে নিচে। পিতৃতান্ত্রিক পরিবার থাকায় মেয়েদের তেমন কোন অধিকার ছিল না।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে

চৌ যুগের লোকেরা বিভিন্ন দেবতার পূজা করত। তাদের প্রধান দেবতার নাম ছিল তিয়েন। মাটিকে মনে করত কৃষির দেবতা। চৌ যুগেও শাং যুগের মতো পূর্বপুরুষের পূজার প্রচলন ছিল। চৌ যুগে চীনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অবদান

চৌ যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। এ যুগের লেখা অনেক গ্রন্থ পাওয়া গেছে।

চীনের প্রাচীর

চৌ বংশের রাজা শি-হুয়াং তি-এর রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল ‘চীনের মহাপ্রাচীর’। হূনদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য এই প্রাচীর তৈরি করা হয়েছিল। দেড় হাজার মাইল দীর্ঘ এই প্রাচীরের উচ্চতা ছিল গড়ে ২৪ ফুট। এই প্রাচীরের উপর দিয়ে ৬ জন অশ্বারোহী পাশাপাশি চলতে পারত। চীনের প্রাচীর বিশ্বের আশ্চর্য বস্তুর একটি।

দর্শনের ক্ষেত্রে অবদান

চীনের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী দার্শনিক ছিলেন কনফুসিয়াস। তিনি চীনাদের মধ্যে আদর্শ জীবনের বাণী প্রচার করেন। খ্রিস্টপূর্ব ২০৬ অব্দে তাঁর নৈতিক দর্শন ধর্মে রূপান্তরিত হয়। এছাড়া চীনের উল্লেখযোগ্য দার্শনিক লাওৎসে, জেনসিয়াস, মোতি।

সার-সংক্ষেপ

প্রাচ্যদেশীয় সভ্যতার মধ্যে চীনা সভ্যতা ছিল অতুলনীয়। চীনা সভ্যতা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। শাং এবং চৌদের আমলে চীনের সমাজ-অর্থনীতি-সভ্যতা ক্রমশ বিকাশ লাভ করতে থাকে। ধর্মক্ষেত্রে প্রথম দিকে প্রকৃতি পূজার প্রচলন থাকলেও পরবর্তীকালে কনফুসিয়াসের শিক্ষায় চীনের সামাজিক এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়। কনফুসিয়াসের মতবাদের মূল দর্শন ছিল মানব কল্যাণ, যা শুধু চীনদেশ নয় বরং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে দ্রুত প্রচারিত হতে থাকে। এই অঞ্চলের মানুষ ক্রমশ ভদ্র আচরণ, সত্যকথন ও মানব কল্যাণকে জীবনের এবং সমাজের অপরিহার্য কর্ম হিসেবে গ্রহণ করে।

বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাসে চৈনিক সভ্যতার অবদান ছিল অপরিসীম। আর এ অপরিসীম অবদান বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে অগ্রগতির দিকে আন্দোলিত করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.১১

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তর কোনটি লিখুন :

১. চীনের তিনটি অঞ্চলে প্রাচীন চৈনিক সভ্যতা গড়ে ওঠে, অঞ্চল তিনটি হলো–

ক. হোয়াংহো নদীর তীরে খ. ইয়াংজে কিয়াং নদীর তীরে
গ. দক্ষিণ চীনে ঘ. সবকয়টি ঠিক

২. চীনা উপকথা অনুযায়ী প্রথম মানুষ হলো–

ক. আদিম মানুষ খ. পান্‌কু
গ. পিকিং মানুষ ঘ. আধুনিক মানুষ

৩. শাং রাজারা কোন নদীর তীরে সভ্যতা গড়ে তোলে?

ক. সিন্ধু খ. ইয়াংসি
গ. হোয়াংহো ঘ. ভূমধ্যসাগর

৪. 'চীনের মহাপ্রাচীর' কোন রাজার আমলে নির্মিত হয়েছিল?

ক. শাং রাজাদের খ. পিকিং রাজাদের
গ. হূন রাজাদের ঘ. চৌবংশের রাজা শি-হুয়াং-তি এর

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. চীনা সভ্যতার পরিচয় দিন।
২. চীনের আদি মানুষ সম্বন্ধে বর্ণনা দিন।
৩. শাং রাজাদের যুগের বর্ণনা দিন।
৪. চৌ-রাজাদের যুগ সম্বন্ধে বিবরণ দিন।

পাঠ-১২ : গ্রিক সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি -

☞ গ্রিক সভ্যতার পরিচয় বলতে পারবেন।

☞ সভ্যতায় গ্রিসের অবদান উল্লেখ করতে পারবেন।

১২.১ পরিচয়

ইউরোপের দক্ষিণ দিকে অবস্থতি বলকান উপদ্বীপ। এর দক্ষিণাংশে একটি ছোট পাহাড়ি দেশ গ্রিস। মূলত গ্রিস একটি পার্বত্যময় দ্বীপ রাষ্ট্র। এর তিনদিক এড্রিয়াটিক সাগর, ভূমধ্যসাগর ও ঈজিয়ান সাগর দ্বারা বেষ্টিত। এ সভ্যতার মূল কেন্দ্র ছিল গ্রিক উপদ্বীপ এবং প্রধান শহর ছিল এথেন্স। ইউরোপ মহাদেশের এ অঞ্চলটিতেই প্রথম সভ্যতার উন্মেষ ঘটে।

আনুমানিক ১৩০০ থেকে ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে গ্রিক সভ্যতার সূচনা হয় এবং খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ ও ৫ম অব্দে (শতকে) গ্রিক সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। তারা ৩৩৮ খৃস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সভ্যতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। গ্রিসের পূর্ব নাম ছিল হেলাস। পরবর্তীকালে রোমানরা এ দেশের নামকরণ করেন গ্রিস। ইউরোপের আধুনিক সভ্যতা অনেকভাবে গ্রিক সভ্যতার নিকট ঋণী। তাই গ্রিক সভ্যতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে ইউরোপীয় সভ্যতা বোঝা যায় না।

গ্রিসের মহাকবি হোমার হাজার হাজার বছরের পুরানো কাহিনী নিয়ে রচনা করেছেন মহাকাব্য 'ইলিয়ড' আর 'ওডিসি'। এখানে রয়েছে প্রাচীন গ্রিসের উন্নত সংস্কৃতির অনেক চমকপ্রদ কথা। মানুষ এসব সম্বন্ধে অবগত হওয়ার পর অনুসন্ধান চালিয়ে আবিষ্কার করেছে গ্রিক সভ্যতার বিভিন্ন দিক।

গ্রিস সভ্যতা গড়ে উঠার আগেই ইজিয়ান অঞ্চলে গড়ে ওঠে এক উন্নত নগর সভ্যতা। ইজিয়ান সাগরের প্রশস্ত দ্বীপ ক্রীটকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে তার নাম দেওয়া হয় মিনীয় সংস্কৃতি। ক্রমে মিনীয় সংস্কৃতি প্রবেশ করে গ্রিসের মূল ভূখণ্ডে।

১২.২ সভ্যতায় গ্রিসের অবদান

গ্রিক সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা রেখেছে এথেন্স। আর এ সংস্কৃতি গ্রিক সংস্কৃতি নাম না নিয়ে বেশি পরিচিত হয়েছে হেলেনীয় নামে। নিম্নে প্রাচীন সভ্যতায় গ্রিকদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ধর্মীয় ক্ষেত্রে

গ্রিকবাসীরা বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাসের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির পূজা করত। তারা বড় বড় যোদ্ধাদের পূজা করত। তাদের প্রধান দেবতা ছিলেন জিউস। দেবতা এপোলা ও দেবী এথেনাও ছিলেন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রের নির্দেশমতো পুরোহিতরা ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতেন। ধর্মমন্দিরে রাখা হতো দেবমূর্তি। উৎসবের সময় মূর্তির গায়ে পরান হতো পরিচ্ছন্ন কাপড়। নগর রাষ্ট্রের মানুষ ডেলোস দ্বীপে অবস্থিত ডিলফীর মন্দিরে রাখা এপোলো দেবতার পূজা করত।

দর্শনে অবদান

সাংস্কৃতিক উন্নয়নে বিশ্ব সভ্যতায় গ্রিকদের সবচেয়ে বড় অবদান ছিল দর্শন চর্চায়। এ পৃথিবী কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে আবার প্রতিদিন কিভাবে এর পরিবর্তন ঘটেছে তা ভাবতে গিয়েই গ্রিসে দর্শন চর্চা শুরু হয়। প্রথম দিকে বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন 'থালেস'। তিনি সূর্যগ্রহণের প্রাকৃতিক কারণ ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তী দার্শনিক ছিলেন সক্রেটিস। তিনি ছিলেন দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান। আদর্শ রাষ্ট্র ও সৎ নাগরিক গড়ে তোলা ছিল তাঁর শিক্ষার মূল লক্ষ্য। অন্যায় শাসনের প্রতিবাদ করার শিক্ষা দেন তিনি। ফলে শাসকগোষ্ঠী হেমলক লতার তৈরি বিষ খাইয়ে তাকে হত্যা করে। পরবর্তীতে সক্রেটিসের ছাত্র প্লেটো গ্রিক দর্শনকে চরম উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। 'রিপাবলিক' নামক গ্রন্থে তাঁর চিন্তাগুলো প্রকাশ পেয়েছে। তিনি সক্রেটিসের শিক্ষার বক্তব্যগুলো নিয়ে 'ডায়ালগস্ অব সক্রেটিস' নামে আর একটি বই লেখেন।

সাহিত্যে অবদান

গ্রিকরা কল্পনাপ্রবণ জাতি ছিল। নিজেদের ঐতিহ্য ও বীরদের দুঃসাহসিক অভিযানগুলো বর্ণনা করতে তারা বেশি পছন্দ করত। হোমারের 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসি' এমন ধারারই কাজ। এছাড়া বহু কবি ও নাট্যকার গ্রিক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল।

ইতিহাস চর্চায়

ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে গ্রিকদের যথেষ্ট দক্ষতা ছিল। গ্রিক ইতিহাসবেত্তা "হেরোডেটাস"কে ইতিহাসের জনক বলা হয়। অন্য খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ ছিলেন 'থুকিডাইডিস'। তাঁকে বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের জনক বলা হয়।

অলিম্পিক খেলায়

বড় কোন প্রয়োজনে বিচ্ছিন্ন নগর রাষ্ট্রগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়া জরুরি। এই চিন্তা হতে তারা একটা উৎসব অনুষ্ঠানের চিন্তা করলেন। যার ফসল হিসেবে শুরু হলো অলিম্পিক খেলা ৭৭৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। প্রতি চার বছর অন্তর অনুষ্ঠিত এ খেলায় বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রের খেলোয়াড়রা অংশ নিত। এ খেলার সূত্র ধরে পারস্পরিক শত্রুতার বদলে গ্রিকদের মাঝে একটি সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে ওঠে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে

গ্রিকরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বেশ অগ্রসর হয়েছিল। তারা প্রথম পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কন করেন। তারা প্রমাণ করেছিল, পৃথিবী একটি গ্রহ এবং নিজ কক্ষপথে আবর্তিত হয়। গণিত ও চিকিৎসা শাস্ত্রে তারা যথেষ্ট অবদান রেখেছিল।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে

প্রাচীন গ্রিকরা স্থাপত্যকলায় অপূর্ব দক্ষতা দেখাতে পেরেছিল। অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত বড় বড় স্তম্ভের উপর তারা প্রাসাদ তৈরি করত। গ্রিক স্থাপত্যের উদাহরণ হিসেবে মন্দির পার্থেনন এবং এথেন্সে দেবী এথেনার মন্দির ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। গ্রিক ভাস্করগণ মনে করত দেবতারা মানুষের মতো দেহধারী। তাই দেবতার মূর্তি তৈরি করতে গিয়ে তারা মানুষের মূর্তি তৈরি করায় খুব ভক্ত হয়ে পড়ে। ভাস্করদের মধ্যে ফিদিয়াসকে গ্রিসের সবচেয়ে খ্যাতিমান ভাস্কর বলে বিবেচনা করা হতো। তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি ৭০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট দেবী এথেনার মূর্তি ভাস্কর্যের ইতিহাসে দুর্লভ সংযোজন।

সংগীত চর্চার ক্ষেত্রে

সংগীত চর্চায় গ্রিকরা যথেষ্ট উৎসাহী ছিল। সংগীত চর্চা করতে গিয়ে তারা অনেক বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভাবন করে। বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে ভালো গাওয়ার প্রয়োজন থেকেই সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রের বিকাশ হয়েছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য

গ্রিসের উপকূলে বেশ কিছু সমুদ্রবন্দর গড়ে উঠেছিল। এ কারণে গ্রিকরা ব্যবসায়ী ও নাবিক হিসেবে দক্ষতা অর্জন করে। তাদের বাণিজ্য জাহাজ ইজিয়ান সাগর ও কৃষ্ণসাগর পাড়ি দিত। অপর্যাপ্ত কৃষি জমি থাকায় গ্রিকরা ৭৫০ থেকে ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগরের তীরে বেশকিছু উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল।

সার-সংক্ষেপ

গ্রিক সভ্যতা শুধু ইউরোপকে নয় গোটা বিশ্বকে আলোর পথে অগ্রসর করে দেয়। দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, সংগীত ইত্যাদি ক্ষেত্রে গ্রিক সভ্যতার অবদান গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.১২

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ লিখুন :

১. ইউরোপ মহাদেশের যে অঞ্চলটিতে সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ঘটে, তার নাম —।

২. গ্রিসের পূর্ব নাম ছিল —।

৩. ইউরোপের আধুনিক সভ্যতা অনেকভাবে — সভ্যতার নিকট ঋণী।

৪. গ্রিসের মহাকবি — হাজার হাজার বছরের পুরানো কাহিনী নিয়ে রচনা করেছেন মহাকাব্য '—' ও 'ওডিসি'।

৫. গ্রিকদের প্রধান দেবতা ছিলেন —।

৬. সক্রেটিসের ছাত্র — গ্রিক দর্শনকে চরম উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যান।

৭. — নামক গ্রন্থে প্লেটো তাঁর চিন্তাগুলো প্রকাশ করেন।

৮. প্লেটো সক্রেটিসের শিক্ষার বক্তব্যগুলো নিয়ে —— নামে আরেকটি বই লেখেন।

৯. — খেলা শুরু হয় ৭৭৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

১০. গ্রিক স্থাপত্যের উদাহরণ হিসেবে মন্দির — , এথেন্সে দেবী — মন্দির ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. গ্রিক সভ্যতার পরিচয় দিন।

২. সভ্যতায় গ্রিসের অবদান উল্লেখ করুন।

৩. ধর্ম ও দর্শনে গ্রিকদের অবদান বিশ্লেষণ করুন।

৪. অলিম্পিক খেলা ও স্থাপত্য ভাস্কর্যে গ্রিকদের অবদান বর্ণনা করুন।

পাঠ-১৩ : রোমান সভ্যতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি -

☞ রোমান সভ্যতার অবস্থান ও পরিচয় বলতে পারবেন।
☞ রোম নগরীর উত্থান সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।
☞ সভ্যতায় রোমানদের অবদান বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

১৩.১ পরিচয় ও অবস্থান

ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণ ভাগে ইতালী অবস্থিত। ইতালীর দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর থেকে উত্তরে আল্পস পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইতালীর তিন দিকে সাগর। ইতালীর একটি নদীর নাম হলো টাইবার। এই টাইবার নদীর দক্ষিণ তীরে প্রাচীন যুগে বিখ্যাত রোম নগরীর পত্তন ঘটে। সাতটি পর্বতের মধ্যবর্তী সমতলভূমি নিয়ে রোম নগরী গঠিত হয়। সে সময়ে ইতালীর ভৌগোলিক অবস্থা বসবাসের জন্য তেমন অনুকূল ছিল না। খনিজ সম্পদ বলতে ছিল মর্মর পাথর, সামান্য কিছু তামা, সোনা এবং লোহা। তবে উর্বর জমি থাকায় কৃষির বিকাশের সুযোগ ছিল যথেষ্ট। প্রাচীন রোম ছিল অরক্ষিত ও চারদিকে উন্মুক্ত। ফলে বাইরের শক্তি সহজেই প্রবেশ করার সুযোগ পেত। যে কারণে রোমের আদি অধিবাসীদের সাথে অনুপ্রবেশকারীদের প্রায়ই সংঘর্ষ হতো।

১৩.২ রোম নগরীর উত্থান

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর একদল মানুষ খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে উত্তর ইতালীতে বসবাস করত। এরা ল্যাটিন নামে পরিচিত ছিল। ক্রমে এদের ভাষা ল্যাটিন ভাষা নামে পরিচিতি লাভ করে। কিংবদন্তি আছে যে, ল্যাটিন রাজা রোমিউলাস একটি নগর পত্তন করে। তাঁর নামানুসারে নগরটির নামকরণ করেন রোম। রোমিউলাস এর পর ছয়জন রাজা রোমে পর পর রাজত্ব করনে। রোম নগরীর পত্তনের পর হতেই রোমে ক্রমশ লোকজনের বসতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত প্রসার ঘটতে থাকে। ক্রমে রোমের শাসকরা সামরিক শক্তির সাহায্যে তাঁদের কর্তৃত্ব ইতালীর অন্যান্য অঞ্চলে বিস্তারের নীতি গ্রহণ করেন। ফলে ইটালীর সর্বত্র এবং ভূমধ্যসাগরের কোন কোন দ্বীপে রোমের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে রোম নগরী একদিনে গড়ে ওঠেনি। বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এই নগরী শক্তিশালী হয়। সম্ভবত ব্যবসা-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে রোমের পত্তন ঘটে। গ্রিসে সভ্যতা যখন তার গৌরবের চূড়ান্ত পর্যায় পৌঁছেছিল তখন ইউরোপের আরেকটি অঞ্চল প্রস্তুতি নিচ্ছে নতুন করে সভ্যতা গড়ার। গ্রিসের উত্তর-পশ্চিমে প্রাচীন রোম নগরী ঘিরে উত্থান ঘটে এ সভ্যতার। ৮ম খ্রিস্টপূর্বাব্দের মাঝামাঝি থেকে ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রোমান সভ্যতা সগৌরবে টিকে ছিল।

১৩.৩ সভ্যতায় রোমের অবদান

যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্য দিয়েই রোমান সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়েছিল। তাই প্রথম পর্বে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রোমবাসী তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেনি। সামান্য কিছূ উন্নয়ন ঘটেছিল প্রজাতন্ত্রের যুগে। ব্যাপক উন্নতি ঘটে সাম্রাজ্যের যুগে। নিম্নে রোমান সভ্যতার অবদানগুলো বর্ণনা করা হলো :

লিখন পদ্ধতি

ষষ্ঠ খ্রিস্টপূর্বের শুরুতে রোমে একটি লিখন পদ্ধতি তৈরি হয়েছিল। এ লেখা ব্যবহার করা হতো আইন ও চুক্তিপত্র তৈরিতে। সমাধি ফলকের গায়ে রোমান লিপি পাওয়া যায়।

দর্শন শাস্ত্রে অবদান

দর্শন চর্চা সবচেয়ে বেশি হয়েছে রোমে। রোমের সবচেয়ে জনপ্রিয় দার্শনিক মতবাদের নাম স্টোয়িকবাদ। এ মতবাদের সাফল্যের পেছনে 'সেনেকা', 'এপিকটেটাস', 'মার্কাস অর্লিয়াস' এই তিন ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তাঁরা মনে করতেন সুখ লাভ করার জন্য প্রয়োজন শৃঙ্খলা ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সত্যবাদী হওয়া।

সাহিত্যে অবদান

সম্রাট অগাসটাস সীজারের যুগে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উন্নতি হয়। এ যুগের কবি হোরাস, ভার্জিল যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ভার্জিলের মহাকাব্য 'ইনিড' বহু ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। ওভিদ ও লিভি ছিলেন এ যুগের দুইজন খ্যাতিমান কবি।

ইতিহাসে অবদান

ইতিহাস চর্চায় রোমানদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ টেসিটাস এ যুগে রোমে জন্মগ্রহণ করেন। রোমান কবি লিভি ঐতিহাসিক হিসেবেও যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন।

স্থাপত্যে অবদান

স্থাপত্যের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ভূমিকা ছিল রোমের। এখানে ইট আর কংক্রিট দিয়ে দালানকোঠা তৈরি করা হতো। দালানের চার কোণায় ব্যবহার করা হতো পাথর। অনেক নকশা আঁকা হতো দেয়ালের গায়ে। সম্রাট হাড্রিয়ানের তৈরি ধর্মমন্দির প্যনথিয়ন রোমের একটি বড় স্থাপত্য নিদর্শন। রোমে 'কলোসিয়াম' নামে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নাট্যশালা তৈরি হয়েছিল। এখানে একসাথে ৫,৬০০ জন দর্শক বসতে পারত। ভাস্কর্যের নিদর্শন হিসেবে রোমে পাওয়া গেছে অনেক মূর্তি। এগুলো ছিল সম্রাট, কর্মকর্তা ও দেবতাদের মূর্তি।

বিজ্ঞানে অবদান

বিজ্ঞানে রোমদের অবদান বেশি নয়। রোমের বিজ্ঞানীদের মধ্যে 'বড় প্লিনি' হলেন বিখ্যাত। তিনি বিজ্ঞান বিষয়ে কয়েক খণ্ড বিশ্বকোষ রচনা করেছিলেন। আর চিকিৎসা বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন বিজ্ঞানী সেলসাস। ইটালিতে বসবাসকারী অপর দুজন বিজ্ঞানী গ্যালেন ও রুফাস বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, যদিও তারা রোমান ছিলেন না।

ধর্মের ক্ষেত্রে অবদান

রোমবাসীরা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করত। জুপিটার তাদের প্রধান দেবতা। এছাড়াও মিনার্ভা, ভেনাস ও নেপচুন রোমের গুরুত্বপূর্ণ দেব-দেবী হিসেবে চিহ্নিত। অগাস্টাস সীজারের সময় থেকে সম্রাটকে পূজার রীতি চালু হয়। রোমে নিজস্ব ধর্মের পাশাপাশি খ্রিস্টান ধর্মের প্রভাব ছিল। খ্রিস্টান ধর্মে মানুষের প্রতি ভালোবাসার কথা বেশি ছিল। তাই মানুষ এ ধর্মে আকৃষ্ট হতে থাকে। কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মে সম্রাটকে পূজা করা যায় না। ফলে যারা খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী হয় তাদের প্রতি সম্রাটদের তরফ হতে শুরু হয় অত্যাচার। এতে সমাজে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা। সবশেষে সম্রাট কনস্টানটাইনের সময় খ্রিস্ট ধর্ম রোমের রাষ্ট্র ধর্মের মর্যাদা লাভ করে।

আইনের ক্ষেত্রে অবদান

আইন সংস্কারের ক্ষেত্রে রোমানদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। প্রথমদিকে আইন লিখিত ছিল না; পরে লিপিবদ্ধ করা হয়। জানা যায় খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০ অব্দে ১২টি ব্রোঞ্জ পাতে সর্বপ্রথম রোমান আইন সংকলিত হয়। রোমান আইনে সকল মানুষ সমান ছিল। রোমান আইন তিনটি শাখায় বিকাশ লাভ করে।

(১) বেসামরিক আইন : এ আইন পালনে নাগরিকরা বাধ্য ছিল। এ আইনও লিখিত ও অলিখিত দুভাবেই পাওয়া যায়।

(২) জনগণের আইন : মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার জন্য এ আইন তৈরি হয়েছিল। এ আইন জাতীয় চেতনার প্রতি অমনযোগীদের উপর প্রয়োগ করা হতো।

(৩) প্রাকৃতিক আইন : এই আইনের বক্তব্য হচ্ছে প্রকৃতিগতভাবেই সকল মানুষ সমান এবং জন্মগতভাবে লাভ করা তাদের মৌলিক অধিকার লংঘন করার ক্ষমতা সরকারের নেই। সিসেরো ছিলেন এই আইনের জনক।

রোমান আইন ছিল নিরপেক্ষ, উদার ও মানবিক। এতে বিধবা ও এতিম দাস-দাসীর অধিকার সংরক্ষণের কথা ছিল। রোমান আইন দাসদের প্রতিও সহানুভূতি প্রবণ ছিল।

সার-সংক্ষেপ

রোমান নগরীকে কেন্দ্র করে প্রাচীন রোমান সভ্যতা গড়ে ওঠে। এটি গ্রিক সভ্যতারই একটি বর্ধিত রূপ হিসেবে বেড়ে ওঠে। তবে প্রাচীন রোমের ইতিহাস ছিল যুদ্ধ-বিগ্রহে পূর্ণ। তবে পরে দর্শন, সাহিত্য, আইন রচনার ক্ষেত্রে রোমানরা অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছে। আধুনিক আইনের ভিত্তিই হলো রোমান আইন। এছাড়াও এক ঈশ্বরবাদী খ্রিস্টধর্ম রোমান সভ্যতা থেকে প্রচার লাভ করে এবং দ্রুত এটি একটি বিশ্বধর্মে পরিণত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.১৩

ক. নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

এক কথায় উত্তর দিন :

১. রোম নগরী কোথায় গড়ে উঠেছিল?
২. কার নামানুসারে রোম নগরীর নামকরণ করা হয়?
৩. রোমান সভ্যতা গৌরবের সাথে কত বছর টিকেছিল?
৪. রোমের সবচেয়ে জনপ্রিয় দার্শনিক মতবাদের নাম কি?
৫. রোমান সাহিত্যের সবচেয়ে উন্নতি হয় কোন সম্রাটের আমলে?
৬. পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রোমান নাট্যশালাটির নাম কি?
৭. রোমবাসীদের প্রধান দেবতার নাম কি?
৮. মিনার্ভা, ভেনাস ও নেপচুন কোন জাতির গুরুত্বপূর্ণ দেব-দেবী?
৯. কোন সম্রাটের সময় খ্রিস্টধর্ম রোমের রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা লাভ করে?
১০. কত সালে সর্বপ্রথম রোমান আইন সংকলিত হয়?
১১. কোন আইনে সকল মানুষ সমান ছিল?

খ. সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. রোমান সভ্যতার পরিচয় দিন।
২. রোম নগরীর উত্থান সম্বন্ধে বর্ণনা দিন।
৩. সভ্যতায় রোমানদের কি গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে?
৪. দর্শন ও বিজ্ঞানে রোমানদের অবদান বর্ণনা করুন।
৫. ধর্ম ও আইনের ক্ষেত্রে রোমানদের অবদান বিশ্লেষণ করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন : ২

বিশদ উত্তর প্রশ্ন

১. মিশরীয় সভ্যতার পরিচয় দিন এবং বিশ্ব সভ্যতায় প্রাচীন মিশরীয়দের অবদান আলোচনা করুন।
২. মেসোপটেমীয় সভ্যতার অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
৩. সুমেরীয় সভ্যতার বিবরণ দিন।
৪. ব্যাবিলনীয় সভ্যতা কোথায় গড়ে উঠেছিল? সভ্যতায় ব্যাবিলনীয়দের অবদান নিরূপণ করুন।
৫. এ্যাসিরীয় ও ক্যালডীয় সভ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৬. সিন্ধু সভ্যতার অবস্থান ও সময়কাল উল্লেখপূর্বক সিন্ধু সভ্যতার অবদান আলোচনা করুন।
৭. ফিনিশীয় সভ্যতার পরিচয় দিন। বিশ্ব সভ্যতায় ফিনিশীয়দের অবদান বর্ণনা করুন।
৮. সভ্যতায় পারসীয়দের অবদান বিশ্লেষণ করুন।
৯. হিব্রুদের পরিচয় দিন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে হিব্রুদের অবদান নিরূপণ করুন।
১০. প্রাচীন চীনা সভ্যতার বিবরণ দিন।
১১. গ্রিক সভ্যতার পরিচয় দিন। প্রাচীন সভ্যতায় গ্রিসের অবদান বিশ্লেষণ করুন।
১২. রোমান সভ্যতা কোথায় গড়ে উঠেছিল? সভ্যতায় রোমানদের অবদান মূল্যায়ন করুন।